মসলার যুদ্ধ

সত্যেন সেন

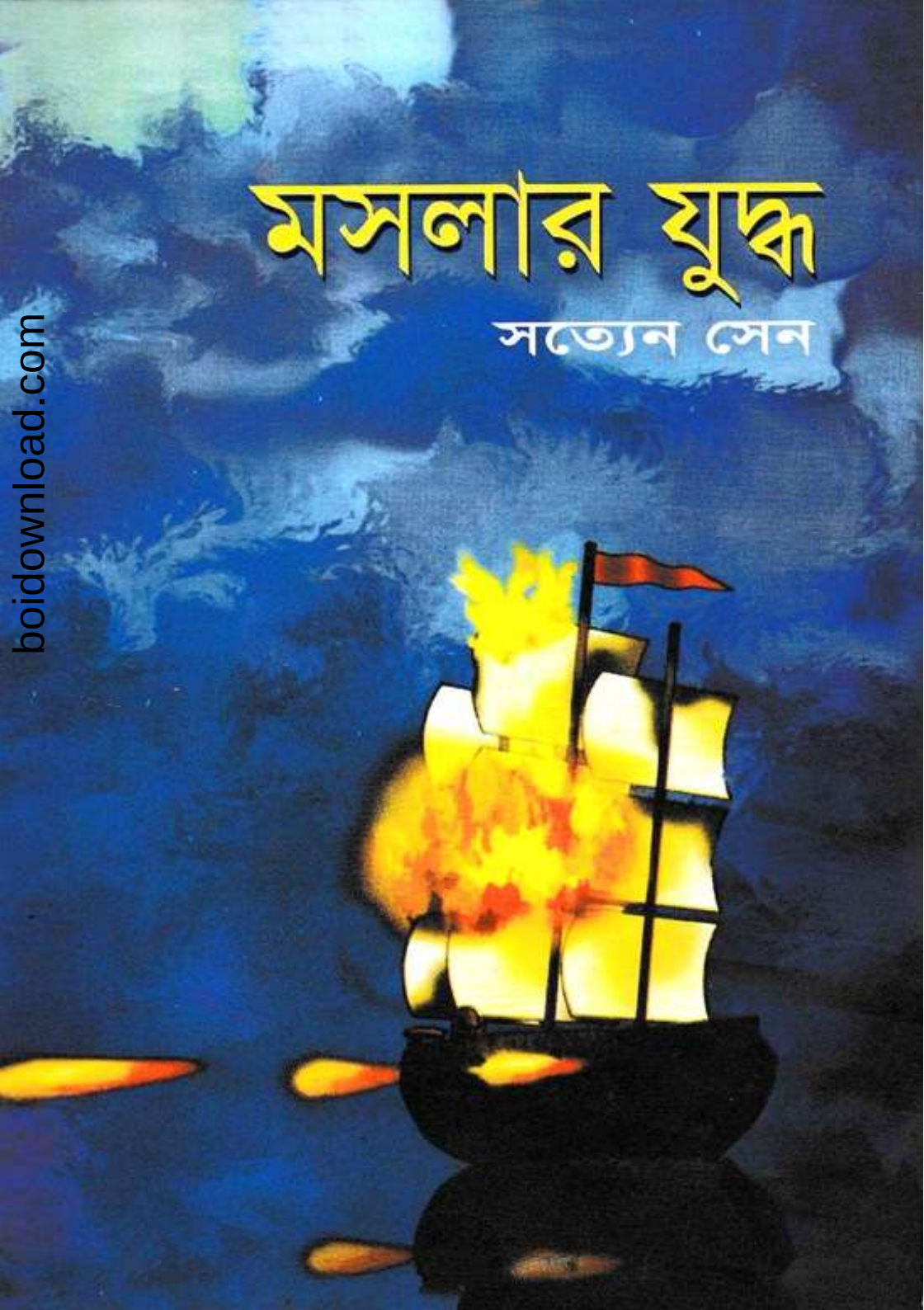

boidownload.com

মসলার যুদ্ধ

সত্যেন সেন

boidownload.com

boidownload.com
boidownload24.blogspot.com

আবেদন

যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে এই প্রজেক্টকে আরো অনেকটা এগিয়ে নেবার জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কোন ডোনেশন চাই না আমরা। আপনার দেওয়া অর্থর জন্য আমরাও কিছু দিতে চাই আপনাদের।

অনুগ্রহ করে boidownload.com তে অংশগ্রহণ করুন। অংশগ্রহণ ফি প্রতিমাসে মাত্র ৩০ টাকা। যার বিনিময়ে আপনি প্রতিমাসে পাবেন বড়দের উপযোগী ৪ (চারটি) বই। আপনার দেওয়া এই অর্থ দিয়ে তৈরী হবে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রতিমাসের মাত্র ৩০ টাকাই দিতে পারে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ইন্টারনেট দুনিয়া। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আপনিও আমাদের এই পথচলায় সামিল হোন। সকলে মিলে এগিয়ে চললে, আমাদের পথচলা মসৃণ হবে। আমরা মনে সাহস পাবো।

ধন্যবাদ

শিশির শুভ্র

boidownload.com

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৯
দ্বিতীয় প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৮০
তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৩

boidownload.com

মুখবন্ধ

স্বাধীনতা-উত্তর কালের বেশির ভাগ সময় শ্রীযুক্ত সত্যেন সেন কাটিয়েছেন পূর্ব বাংলার কারাগারগুলোতে রাজনৈতিক বন্দীরূপে। সেই বন্দীদশায় তাঁর বেশির ভাগ বই লেখা হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে সব বই পূর্ব বাংলায় পাঠক-চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

'মসলার যুদ্ধ' এই বইগুলোর একটি। এই ছোট বইটিতে ইতিহাসের একটি পুরোনো অধ্যায়কে তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত মনোজ্ঞরূপে। মসলার বাণিজ্য করে কালিকট রাজ্যে এককালে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। সেই সমৃদ্ধি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল পোর্তুগালের-কালিকটে অধিকার বিস্তার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু হয় পঞ্চদশ শতকে। কিন্তু শুধু কালিকট নয়। মসলার উৎপাদন বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। পোর্তুগালের দেখানো পথ ধরে সেখানে এল ওলন্দাজরা, তারপর ইংরেজরা-সপ্তদশ শতাব্দীতে।

মসলার লোভে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের অভিযান এবং ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাদের উপনিবেশ-স্থাপনের বিচিত্র কাহিনী এ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে। শুধু ইতিহাসের তথ্য নয়, এর অন্তরালবর্তী সত্যই লেখককে আকর্ষণ করেছে বেশি। তাই যে-সব শক্তি ইতিহাসের ধারাকে গতি দেয়, সেগুলো উদঘাটন করেছেন লেখক। সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিক তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে।

একদিকে উপনিবেশ-স্থাপন ও সাম্রাজ্য-বিস্তার, কুৎসিত লোভ ও বর্বর অন্যায়, মানুষের জীবনযাত্রা-নিয়ন্ত্রণের ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা; অন্যদিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রাম, দেশীয় শক্তি ও সম্পদ বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা, বেঁচে থাকবার প্রাণান্ত প্রয়াস। 'মসলার যুদ্ধ' তারই ইতিবৃত্ত।

boidownload.com

সরল ভাষায়, মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে, মর্মস্পর্শী করে এ বিবরণ শ্রীযুক্ত সত্যেন সেন লিপিবদ্ধ করেছেন। আশা করি, পাঠকদের তা ভাল লাগবে।

আনিসুজ্জামান বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৭-৭-১৯৭১

boidownload.com

এক

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলছি। কালিকটের বন্দরে অজস্র জাহাজের ভিড়। ছোট, বড় নানা আকারের নানা রকমের পালতোলা জাহাজ বাণিজ্যের পসরা বয়ে বন্দর ছেড়ে দেশবিদেশে যাত্রা করছে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিক থেকে জাহাজের পর জাহাজ এসে ভিড়ছে। কালিকটের বন্দর নিমেষ মাত্র বিশ্রাম পায় না। প্রতিটি জাহাজের সামনে নিশান ওড়ে। বন্দরের লোকেরা তাই দেখে দূরে থাকতেই বলে দিতে পারে, কোনটা কোন দেশের জাহাজ। আরব বণিক, হিন্দু বণিক, গুজরাটের মুসলমান বণিক, এদের জাহাজই সংখ্যায় বেশী। চীনা বণিকদের জাহাজের আসা যাওয়া আছে। তাছাড়া এদিক ওদিক থেকে আরও জাহাজ যাতায়াত করে। কিন্তু আরবের বণিকরা সমস্ত বণিকদের ছাড়িয়ে উঠেছে। বাণিজ্যে তাদের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারে না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে বর্তমান ব্যাঙ্গালোর থেকে কুমারিকা প্রণালী পর্যন্ত আরব সাগর-তীরবর্তী যেই ভূভাগ তার নাম মালাবার বা কেরল। এই ভূভাগের পূর্বদিকে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগর। দুয়ের মাঝখানে দুর্ভেদ্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। এই মালাবার অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকেই গোলমরিচের দেশ বলে খ্যাত। দু'হাজার বছর ধরে এখানকার বণিকরা মসলাপাতি, বস্ত্র, মণিমুক্তা, গজদন্ত প্রভৃতি পণ্যে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বাণিজ্য করে আসছে। মালাবার অঞ্চলে কতগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নিরাপদ আড়ালে তারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পেরেছে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কালিকট। কালিকটের রাজার বংশগত নাম জামোরিন।

কালিকট রাজ্য হিসেবে বড় না হলেও তার শক্তি ও সম্পদ ছিল প্রচুর। এই শক্তি ও সম্পদের মূল কারণ মসলা। কয়েক শতাব্দী ধরে কালিকট মসলার

boidownload.com

boidownload.com

বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বলে গণ্য ছিল। মালাবার অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ, এলাচি প্রভৃতি মসলা উৎপন্ন হোত। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মসলা উৎপন্ন হোত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে অর্থাৎ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। কিন্তু এখানকার সমস্ত মসলাও কালিকট বন্দরে চলে যেত। পরে সেখান থেকে ইউরোপের দেশগুলোতে চালান করা হোত। তখনকার দিনের ইউরোপীয়দের রান্নায় এসব মসলা ছাড়া কিছুতেই চলত না। আর এসব মসলা ভারতবর্ষ, মালয় আর ইন্দোনেশিয়া ছাড়া আর কোথাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। এক গোলমরিচের কথাই ধরা যাক। গোলমরিচ আজকাল আমাদের কতটুকু কাজেই বা আসে! কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি তখন এই গোলমরিচ মনিমুক্তার মত মূল্যবান বলেই গণ্য হোত, এ কথা শুনালে কে বিশ্বাস করবে? এই গোল মরিচের জন্য মানুষ কী না করেছে? জীবন হাতে নিয়ে বিপদ-সংকুল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, কত লোক এরই জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। কাজেই সে সময় কালিকট বন্দরের খ্যাতি বলতে গেলে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। বন্দরের ব্যবস্থা ছিল খুবই ভাল। পারস্যের রাজদূত আবদুর রাজ্জাক একবার সে সময় এদেশে এসেছিলেন। কালিকট বন্দর দেখে তিনি বলে গেলেন, প্রত্যেকটি জাহাজ, যে-কোন দেশ থেকে আসুক না কেন, যে-কোন দিকেই যাক না কেন, তাকে অন্যান্য জাহাজের মতই সমদৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে।

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধি উপছে পড়ছিল। বাণিজ্যসূত্রে বা বাণিজ্য উপলক্ষে কত দেশের কত লোকই না। এই বন্দরে আর নগরে ভিড় জমিয়েছে! তাদের কার মনে কি ছিল কে জানত!

এই সময় একদিন একটা আরবী জাহাজ থেকে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নামলেন। তার মুখের গড়ন আর গায়ের রঙ আরবদের মত নয়। তিনি আরবের মুসলমানের পোশাক পরে এসেছিলেন। কিন্তু এদেশের লোক আরব দেশের লোকদের ভাল করেই চেনে। সেইজন্যই ভদ্রলোক কারো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন। তারা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক যখন একজন আরব বণিককে আস্‌সালামু ওয়ালায়কুম জানিয়ে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, তখন আর কারো মনে কোন সন্দেহ রইল না। ভদ্রলোক স্বচ্ছন্দে এখানকার আরবদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

কিন্তু এই ছদ্মবেশী লোকটির প্রকৃত পরিচয় সেদিন কেউ পায় নি। লোকটি পোর্তুগীজ। তার নাম পেরো দ্য কোভিলহাম। পোর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় ডোম জোয়াও কালিকট বন্দর ও কালিকট রাজ্যের ভেতরকার খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসবার জন্য গুপ্তচর হিসেবে তাকে পাঠিয়েছিলেন।

এর ঠিক দশ বছর বাদে পোর্তুগীজরা প্রকাশ্যেই এল। ভারত-বর্ষের সঙ্গে মসলার বাণিজ্য করবার জন্য জাহাজ সাজিয়ে নিয়ে এল। এই পোর্তুগীজ বণিক দলের অধিনায়কের নাম ছিল 'ভাস্কো দ্য গামা'। এ নামটা অনেকের কাছেই পরিচিত। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এই হিসেবেই তাঁর নাম সুপরিচিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভারতবর্ষের মাটিতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির এই প্রথম পদক্ষেপ। সেইজন্যই ভাস্কো দ্য গামার নাম আর ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দটা আমাদের পক্ষে স্মরণ করে রাখবার মত।

পোর্তুগীজদের জাহাজগুলো সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেমন মজবুত গঠন তেমনি ক্ষিপ্র তাদের গতি। বন্দরের লোকরা অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। জাহাজ তো নয় যেন জলচর প্রাণী । জলচর প্রাণীর মতই স্বচ্ছন্দ তাদের গতি।

কিন্তু শুধু তাই নয়, তার চেয়েও বেশী আকর্ষণের জিনিস ছিল। ওরা ওদের জাহাজের সামনে কামান সাজিয়ে এনেছে। এদেশের মানুষ তার আগে কখনও কামান দেখে নি। কামানের নামও খুব কম লোকেই শুনেছে। ওরা অবাক

boidownload.com

হয়ে বলাবলি করতে লাগল। ওগুলো আবার কিগো? কত দেশের কত জাহাজ এখানে এসে ভিড়ে, কিন্তু কই, এগুলো তো কোনদিন দেখি নি।

কামানের মর্ম জানে আরব বণিকরা। তারা দেশবিদেশে সফর করে বেড়ায়, কামানের সঙ্গে তাদের ভাল করেই পরিচয় আছে। তারা কামানের বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বলল। ওরা শুনল বটে, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারল না! বলল, তোমরা এ সমস্ত কাহিনী কোথায় পাও? হ্যাঁ, ছিল বটে এক কালে। রামায়ণে অগ্নিবানের কথা আছে। কিন্তু এই কলিযুগে সে কি আর সম্ভব? তাছাড়া সে তো মন্ত্রপূত বাণ, এই ম্লেচ্ছরা কেমন করে তাদের আয়ত্ত করবে?

এই কামানের কথা নিয়ে আরব বণিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। কালিকটের রাজা জামোরিনের কপালেও উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

boidownload.com

দুই

মসলা-যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করতে গেলে আরও পেছনের দিকে ফিরে খেতে হয়। ক্রুসেডের গল্প অনেকেরই জানা আছে। যেরূযালেম খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, –এইখানে যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। এই যেরুযালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে। সে সময় এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকা, এই তিন মহাদেশেই মুসলমান ও খ্রীস্টানরা পরস্পরে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। যেরুযালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য খ্রীস্টান রাজ্যগুলো পরস্পর হাত মিলাল। ক্রসেড অর্থাৎ ধর্ম-যুদ্ধের আহ্বানে সে সময় সারা ইউরোপময় প্রবল ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী এরা সবাই এই জোটের মধ্যে ছিল। তাদের এই জোটবাঁধার পেছনে ধর্মীয় কারণ-যে ছিল না তা যায়। কিন্তু এই উপলক্ষে প্রতিযোগী শত্রুকে দমন করবার অভিপ্রায়টাও বেশ স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছিল। প্রবল উচ্ছাসের মুখে প্রথম তিনটি ক্রুসেডে খ্রীস্টানরা সাফল্য লাভ করল, কিন্তু এই পর্যন্ত। তারপরই তাদের দুঃসময় দেখা দিল। ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে বীর সালাদিন খ্রীষ্টানদের হাত থেকে যেরুযালেমকে পুনরাধিকার করে নেন। তারপর থেকে এই জোট-বাধা শক্তিগুলো আর কোনদিন যেরুযালেমকে দখল করে নিতে পারে নি।

এই সময় মিশর মুসলমানদের হাতে চলে আসবার ফলে খ্রীস্টান রাজ্যগুলো খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল। ইউরোপ আর এশিয়া, তার মাঝখানে মিশর। মুসলমানদের এই শক্তিশালী কেন্দ্রটিকে এড়িয়ে ভারতবর্ষে যাবার কোনই উপায় ছিল না। অথচ ভারতবর্ষের বিপুল সম্পদের কাহিনী তখন ইউরোপময় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে আরও কাছাকাছি আসবার ফলে এসব খবর আরও বেশী করে তাদের কানে আসত। সত্যে, মিথ্যায় জড়িয়ে কত কথাই না এসে পৌছত! মধুর গন্ধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে মধুকরের দল। কিন্তু পথের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিশর। এখন কি করবে তারা?

অথচ ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বহুকাল আগে থেকেই গ্রীস আর ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মিশর এই সময় রোমের অধীন ছিল। সেই সময় মিশরের বন্দর থেকে রোমের জাহাজগুলো নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে মাল কেনা-বেচা করত। আরিক্ক্যামেদুর খননের ফলে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম শতকে রোম সামাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ; গ্রীক ও রোমীয় ভৌগোলিকেরা ভারতবর্ষের উপকূল সম্পর্কে ভাল ভাবেই

boidownload.com

ওয়াকিফহাল ছিলেন। এমন কি তারা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

ইউরোপের অন্ধকার যুগে এই সম্পর্কের ছেদ পড়ে গিয়েছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরবের বণিকেরা তাদের জায়গা দখল করে নিল। কিন্তু জায়গা দখল করে নিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকে নি। দেশবিদেশের ঐশ্বর্যকে করায়ত্ত করবার জন্য দুঃসাহসিক আরব বণিকরা জীবন পণ করে দুরন্ত সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। ফলে আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর আরব বণিকদের বাণিজ্য জাহাজে ছেয়ে গিয়েছিল। ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে আরবদের বাণিজ্যের এই বিরাট অগ্রগতি ইউরোপীয় রাজনৈতিকদের দৃষ্টিপথে এল। তারা বুঝলেন ভাগ্য-লক্ষ্মীকে জয় করতে হলে ঐশ্বর্যের মণিকোঠা ভারতবর্ষে পৌছবার পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

কিন্তু ইসলামধর্মী মিশর আর সিরিয়ার উপকূল এই পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলেই ইউরোপীয় রাজনৈতিকরা সোজাসুজি মিশরের বিরুদ্ধেই তাদের পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত করেছিলেন। ফ্রান্সের সেন্ট লুই ছিলেন এই ধর্মযুদ্ধের নেতা। আরও অনেক রাজা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধেও তাদের হার মানতে হোল। মিশর ও সিরিয়ার উপকূল মুসলমানদের হাতেই থেকে গেল।

মসলা ছাড়া ইউরোপীয়দের চলে না। যে-কোন ভাবেই হোক মসলা পেতেই হবে। মসলা আসবার দুটো পথ-একটা মিশরের মধ্য দিয়ে, আর একটা পারস্যের মধ্য দিয়ে। ইউরোপকে এ বিষয়ে একান্তভাবে মিশরের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। মিশরের একচেটিয়া ব্যবসা, তার বণিকরা মসলার দাম চড়িয়ে দিয়ে আসল দামের তিনগুণ আদায় করতে লাগল। ওদিকে পারস্যের লোকও ইসলামধর্মী, খ্রীষ্টান বণিকদের সেই পথ ধরে মসলার সন্ধানে যাওয়া সম্ভব ছিল

boidownload.com

না। কিন্তু পারস্যে যখন তাতারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোল তখন এই পথটা খুলে গেল। তাতার খানরা তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। তারা ইতালীর বণিকদের মসলা আনবার জন্য পারস্যের উপর দিয়ে ভারতবর্ষে যাবার অনুমতি দিলেন। তার ফলেই তখনকার দিনের ইউরোপীয়েরা জানতে পারল, মসলা কোন্ দেশে জন্মায়, আর তার সত্যিকারের দামই বা কি রকম। কিন্তু সে পথ বেশী দিনের জন্য খোলা রইল না। মুসলমানদের বাধা ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে তাদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলো সরাসরি মিশরের আরব বণিকদের কাছ থেকে মসলা বা পূর্বাঞ্চল থেকে আমদানি করা অন্যান্য পণ্য কিনতে পারত। সোল এজেন্ট বললে যা বোঝায়, ভেনিস রাজ্য ছিল তাই। ভেনিসের বণিকরা এ বিষয়ে খুই ধুরন্ধর ছিল। যে-কোন ভাবেই হোক মিশরের বণিকদের সঙ্গে তাদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মিশরের বণিকরা কেবলমাত্র তাদের হাতেই এই সমস্ত পণ্য বিক্রী করত। আর তাই দিয়ে ভেনিসের বণিকরা সমস্ত ইউরোপের মধ্যে একচেটিয়া ব্যবসা চালাত।

বিভিন্ন রাজ্যের বণিকদের ভেনিস থেকে এই সমস্ত পণ্য কিনে নিয়ে যেতে হোত। এরই ফলে ভেনিস অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ভেনিসের সঙ্গে তার প্রতিবেশী জেনোয়া রাজ্যের প্রতিযোগিতা বহুদিন ধরেই চলে আসছিল। জেনোয়া ভেনিসের একচেটিয়া মসলার ব্যবসায় ভাগ বসাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, তারা পারস্য উপসাগরে তাদের বাণিজ্য জাহাজ মোতায়েন করবে, যাতে মসলার বাণিজ্য-টাকে লোহিত সাগর থেকে পারস্য উপসাগরের পথে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। তারা পারস্যের ইলখান আরঘুনের কাছে এই প্রস্তাবটি দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনাকে কাজে লাগানো গেল না।

boidownload.com

boidownload.com

এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও জেনোয়া কিন্তু হাল ছাড়ল না। তারা সন্ধান করতে লাগল, একটানা জলপথে ভারতবর্ষে যাবার কোন পথ আবিস্কার করা যায় কিনা। শুধু জেনোয়া নয়, ইউরোপের আরও কতগুলো দেশের নাবিকরা এই একই চেষ্টা করছিল। কেননা এই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যায় সাহায্যে একই সঙ্গে মুসলমানদের ও ভেনিসের একচেটিয়া ব্যবসার উপর ঘা মারা যায়। এদের মধ্যে জেনোয়ার উগোলিনো দ্য ভিডাগডোর অভিযানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়া থেকে যাত্রা করে জিব্রালটার হয়ে আফ্রিকার উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছিলেন।

সমুদ্রে নৌ-চালনার ব্যাপারে পোর্তুগাল নানাভাবেই জেনোয়ার কাছে ঋণী। সত্য কথা বলতে হলে তাকে এ বিষয়ে জেনোয়ার উত্তরাধিকারী বলা চলে। ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগালের জাহাজগুলোর যিনি অধিনায়ক ছিলেন, তিনি একজন জেনোয়াবাসী। তার নাম ম্যানুয়েল পেসানহা। শুধু তিনি নন, তাঁর অধীন কাপ্তানরা সবাই ছিল জেনোয়াবাসী। এটা অনুমান করে নেওয়া যায়, আফ্রিকা মহাদেশকে প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে যাবার পরিকল্পনাটা সর্বপ্রথম জেনোয়াবাসীদের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি।

জেনোয়ার এই অসমাপ্ত কাজ পোর্তুগাল নিজের হাতে তুলে নিল।

তিন

কিন্তু এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে বহু তেল নুন কাঠ খরচ করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ধরে তারই প্রস্তুতি চলেছে। এই প্রস্তুতির ব্যাপারে পোর্তুগাল নেতৃত্ব নিয়েছিল। একথা সত্য বহু দেশের বহু লোকের দীর্ঘ

দিনের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই কাজ শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও পোর্তুগালের রাজা ডোম হেনরীর, যিনি নাবিক হেনরী নামে সুপরিচিত, এ বিষয়ে ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মসলা আমদানির প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। এই দুনিয়াটা মুসলমান না খ্রীষ্টান কার প্রভাবে আসবে, ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে তারই পরীক্ষা চলছিল। ক্রুসেড শেষ হয়ে গেলেও তার শেষ মীমাংসা হয় নি। পনেরো শতকে পোর্তুগাল রাজা ডোম হেনরী খ্রীষ্টান শক্তি হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতার স্থান অধিকার করেছিলেন, এ কথা বলা চলে। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিদের মধ্যেও যে মুসলিম আতঙ্ক ছিল না তা নয়। কিন্তু পোর্তুগালের কথা স্বতন্ত্র।

পোর্তুগাল ও স্পেনকে সব সময়ই নিকটবর্তী মুসলিম রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হোত। কাজেই তাদের মধ্যে ক্রুসেডের মনোভাব তখনও অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে।

তখন ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার মসলার বাজার সম্পূর্ণ ভাবে মুসলমানদের হাতে। তাদের সম্পদ ও শক্তির প্রধান উৎস সেইখানে। কোন ইউরোপীয় শক্তির সেখানে দন্তস্ফুট করবার সুযোগ ছিল না। এইখানেই তাদের দুর্বলতা। এইখানেই তাদের আতঙ্ক। মুসলমানদের পতন ঘটাতে হলে সেই মোক্ষম জায়গায় আঘাত করতে হবে, মসলার বাজারকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে তাদের মুঠো থেকে। ডোম হেনরী প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। অবশ্য খ্রীষ্টাননের পবিত্র দায়িত্বই একমাত্র কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা ছিল।

মসলা যে-দেশে জন্মায়, পোর্তুগালের বাণিজ্যের জাহাজ যদি সেখানে গিয়ে পৌছতে পারে, তাহলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জল হয়ে উঠবে। তখন কোথায় পড়ে থাকবে ভেনিস, কে মনে রাখবে তার কথা? ইউরোপের বণিকেরা মসলার আশায় দলে দলে ছুটে আসবে তার কাছে, মুঠো মুঠো সোনা ঢালবে তার পায়।

boidownload.com

আর সেই সোনার দৌলতে ক্ষুদ্র ও নগণ্য পোর্তুগাল একদিন সারা ইউরোপের সমাট হয়ে দাঁড়াবে।

সমস্ত পৃথিবী একদিন খ্রীষ্টান পৃথিবীতে পরিণত হয়ে যাবে, আর তাদের সবার সামনে পুরোভাগে থাকবে পোর্তুগাল-এই মহাপ্রেরণা হেনরীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। তিনি বাছা বাছা গাণিতিক, মানচিত্রকারক, জ্যোতির্বেত্তা ও সুদক্ষ নাবিক এনে জড় করলেন। তাদের সাহায্যে আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে যাবার এই একটানা জলপথ অন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চলল।

পোর্তুগীজদের প্রধানত দু'রকম জাহাজ ছিল। একরকম হালকা দ্রুতগতি জাহাজ, তার নাম ক্যারাভেল। আর এক রকম জাহাজের নাম গ্যালিওন। এগুলো ভারী আর ধীরগতি, এগুলোই কামান বয়ে নিয়ে যেত। হেনরী বুঝতে পেরেছিলেন, তখনকার দিনের প্রচলিত ধরনের জাহাজ দিয়ে এই দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সেইজন্যই তাঁর উদ্যোগে জাহাজগুলোর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়। পোর্তুগীজদের সাফল্যের এটাও একটা কারণ।

অজানা এই মহাদেশ আফ্রিকা। তার সুদীর্ঘ পশ্চিম উপকূলে কোনদিন কোন নাবিক তার জাহাজ ভিড়ায় নি। দুরদর্শী হেনরী তার নাবিকদের শিক্ষাদানের জন্য নৌ-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুশিক্ষিত নাবিকরা পথের সন্ধানে উপকূল ধরে এগিয়ে চলল। এই অজানা দেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা উপকূলের স্থানে স্থানে যেখানে সম্পদের গন্ধ পেয়েছে, সেখানে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের হটিয়ে দিয়ে সেই সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। পথের সন্ধানে এগিয়ে চলতে চলতে আফ্রিকা মহাদেশে পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যের বীজ বুনে চলছিল তারা। এই অনুসন্ধান শেষ করতে বহু বৎসর কেটে গিয়েছিল।

boidownload.com

boidownload.com

পোর্তুগীজদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা চারদিকে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। খ্রীস্টান জগতের ধর্মীয় নেতা রোমের পোপ এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। পোপ পঞ্চম নিকোলাস ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্যন্ত পোর্তুগীজরা যা কিছু আবিষ্কার করবে, তার উপর রাজা হেনরীর একমাত্র অধিকার দান করেন। এই উপলক্ষে তারা নিম্নোক্ত ঘোষণা জারী করেছিলেনঃ

"আমরা একথা জানতে পেরে বিপুল পরিমাণ আনন্দলাভ করেছি যে, আমাদের প্রিয় সন্তান পোর্তুগাল-রাজা হেনরী তাঁর স্মরণীয় পিতা রাজা জনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খ্রীস্টের নির্ভীক সৈনিকের মত উৎসাহে অনুপ্রাণিত চিত্তে বহুদূরবর্তী ও অজানা দেশগুলোতে ঈশ্বরের নাম বহন করে নিয়ে গিয়েছেন এবং আরব-জাতি ও অবিশ্বাসীদের মত ঈশ্বর ও খ্রীস্টের বিশ্বাসঘাতক শত্রুদেরও ক্যাথলিক খ্রীস্টান সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

রাজা হেনরী মহাসমুদ্রের ভেতরে জনশূন্য দ্বীপগুলোতে কতগুলো খ্রীস্টান পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালনের জন্য গীর্জা স্থাপন করেছেন। যতদূর জানা আছে এ পর্যন্ত কেউ সমুদ্রপথে প্রাচ্যদেশের দূর উপকূলে পৌঁছতে পারে নি। একথা স্মরণ রেখে রাজা হেনরী এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে, যদি তাঁর চেষ্টার ফলে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পৌঁছা সম্ভবপর হয়-যে-ভারতবর্ষের মানুষ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছে বলে কথিত আছে, তাহলে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপস্থিত করতে পারবেন। যদি তিনি সেই দেশের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, তাহলে ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য অঞ্চলের খ্রীস্টানদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সে সব দেশের যে-সকল লোক ধর্ম থেকে বঞ্চিত এবং এখন পর্যন্ত ইসলামের কালব্যাধিতে যারা

আক্রান্ত হয় নি, সেখানকার রাজার অনুমতি নিয়ে তাদের মধ্যে খ্রীস্টধর্মের জ্ঞান বিতরণ করতে পারবেন।

গত পঁচিশ বছরে পোর্তুগাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই কঠিনতম বিপদের মধ্য দিয়ে এবং কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তিনি তার দ্রুতগামী ক্যারাভালের সাহায্যে মহাসাগরের পরপারে কুমেরুর অঞ্চলগুলোতে অবিরাম অনুসন্ধান করে চলেছেন। এবং বহু সমুদ্র অতিক্রম করে গিনি প্রদেশে পৌঁছেছেন।

আমরা সতর্কভাবে পর্যালোচনা করে এবং আমরা ইতিপূর্বে আমাদের ঘোষণার মাধ্যমে খ্রীস্টের শত্রু আরবজাতি বা অবিশ্বাসীদের দ্বারা শাসিত দেশগুলোকে আক্রমণ, জয় ও অধীন করে রাখবার জন্য রাজা অ্যাফনসোকে যে-অধিকার প্রদান করেছি, সে কথা বিবেচনা করে এই ঘোষণা দ্বারা আমাদের এই ইচ্ছাই জ্ঞাপন করছি যে, রাজা অ্যাফনসো ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ পূর্বোক্ত দ্বীপ ও বন্দরগুলো এবং নিম্নোক্ত সমুদ্রগুলো অধিকার ও ভোগ করে চলুন। পূর্বোক্ত অ্যাফনসো ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ছাড়া ওগুলো সম্পর্কে তাদের প্রভুত্বের উপর হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া যে-কোন বিশ্বাসী খ্রীস্টানের পক্ষে নিষিদ্ধ। যা কিছু জয় করা হয়েছে বা জয় করা হবে, বাজাডোর প্রণালী, নন্ প্রণালী ও গিনি উপকূল পর্যন্ত যত দেশ জয় করা হয়েছে এবং প্রাচ্য অঞ্চল সকল সময়ের জন্য ও ভবিষ্যতের জন্য রাজা অ্যাফনসোর প্রভুত্বাধীন থাকবে।”

১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম নিকোলাসের এই ঘোষণাকে অনুমোদন করে তৃতীয় ক্যালিকেটাস অনুরূপ একটি ঘোষণা দেন।

পোপের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সমগ্র প্রাচ্য অঞ্চলকে জয় করবার ও ভোগ করবার একচ্ছত্র অধিকার পোর্তুগালের হাতে

boidownload.com

ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলেই প্রাচ্যের বাজার দখল করতে গিয়ে পোর্তুগালকে বহুদিন পর্যন্ত খ্রীস্টান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় নি।

এই ঘোষণার মধ্যে দুটো জিনিস লক্ষ্য করবার মত। প্রথম কথা ক্রুসেডের যুগ পার হয়ে এলেও, ক্রুসেডের মনোভাবের কোনই পরিবর্তন হয় নি। তাই দেখতে পাই কি তীব্র মুসলমান-বিদ্বেষ এই ঘোষনার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে!

দ্বিতীয় কথা, খ্রীস্টান জগতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপের ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের লোকেরা খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী। রাজা হেনরী পথ রচনা করে দিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার পরিণতি দেখে যাবার সুযোগ তিনি পান নি। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও তার প্রদর্শিত পথ ধরেই এই অভিযান এগিয়ে চলতে থাকে। ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দে বার্থেলেমি ডিয়াজ কেপ অব গুড হোপ আবিষ্কার করেন। ভারত মহাসাগারের জলরাশি তাদের চোখের সামনে ঝলসে উঠল।

দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনার পর এতদিনের স্বপ্ন এবার পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। অবশেষে এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন বসল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, এ একটা অবাস্তব কল্পনা। এই মরীচিকার পেছনে ছুটলে শুধু রাজ্যের অর্থনাশই সার হবে।

কিন্তু রাজা ডোম ম্যানুয়েল স্বয়ং এই অভিযানের পক্ষে। কোন আপত্তি মানলেন না। তিনি, আদেশ দিলেনঃ জাহাজ প্রস্তুত করো।

boidownload.com

চার

পুরানো ইতিহাসটাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার আমরা ফিরে এলাম ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

১৪৯৭ খ্রীস্টাব্দে ৮ই জুলাই তারিখে পোর্তুগালের ট্যাগাস নদীর মুখে বেলেম পোতাশ্রয় থেকে চারটি জাহাজ ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করল। প্রথম দু'টি জাহাজের নাম স্যান গাব্রিয়েল ও স্যান র‍্যাফেল। স্যান গাব্রিয়েলে ২০টি কামান সাজানো ছিল।

এই অভিযানের অধিনায়ক বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কো দ্য গামা ; সাধারণের মধ্যে একটা চলতি ভুল ধারণা আছে যে, ভাস্কো দ্য গামা সর্বপ্রথম এই নতুন পথ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু পথ আবিষ্কারের ব্যাপারে ভাস্কো দ্য গামার বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। আমরা আগেই দেখেছি, পোর্তুগালের সুশিক্ষিত নাবিকেরা ইতিপূর্বেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে চলাচল করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কেপ অব গুড হোপ ছাড়িয়ে তারা ভারত মহাসাগরে এসে পড়ল। এখান থেকে মোজাম্বিক পর্যন্ত খুবই সহজ পথ। কিন্তু এর পরই কঠিন পথ। ভারত মহাসাগরকে সোজাসুজি পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে গিয়ে পৌছতে হবে। এ সময় মিলিন্দির রাজা একজন ভারতীয় নাবিক দিয়ে ভাস্কো দ্য গামাকে সাহায্য করেন। মিলিন্দি মোজাম্বিকের উত্তরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী একটি রাজ্য।

এই ভারতীয় নাবিক পোর্তুগীজ বহরকে ভারতবর্ষের দিকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই এ সব পথ ঘাট ভারতীয় নাবিকদের কাচে বাল করেই জানা ছির। তারা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের বন্দরে বন্দরে চলাচল করত। এমন কথাও শোনা গেছে যে, তারা নাকি কেপ অব গুড হোপ ছাড়িয়ে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা প্রমান করবার মত উপুক্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই।

boidownload.com

boidownload.com

দশ মাস বারো দিনের একটানা দীর্ঘ ভ্রমণের পর ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ মে তারিখে ভাস্কো দ্য গামা জামোরিনের রাজা কালিকটের ঘাটে এসে পৌছলেন। কামানে সুসজ্জিত এই পোর্তুগীজ বাণিজ্য বহরের আগমনকে আরব বণিকেরা প্রীতির চোখে দেখতে পারেনি, একথা না বললেও চলে। বন্ধুস্থানীয় আরব বণিকদের মুখে নবাগত বণিকদের প্রকৃতি-ও উদ্দেশ্যসম্পর্কে নানা কথা শুনে এবং বিশেষ করে তাদের জাহাজের কামানসজ্জা দেখে জামোরিন-যে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাস্কো দ্য গামা যখন কালিকটের বন্দরে বাণিজ্য করবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন জামোরিন তা মঞ্জুর করতে দ্বিধা করেননি। ভাস্কো দ্য গামা কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হন নি। তিনি এক অসঙ্গত আবদার ধরে বসলেন যে, তাকে বন্দরের প্রচলিত শুল্কের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। সেদিন এর মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ বিপদের সংকেত সূচিত হয়ে উঠেছিল।

কালিকটে এসে ভাস্কো দ্য গামা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। কালিকট বন্দর-সম্পর্কে যে-সমস্ত খবর তারা সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রধান খবরটাই ছিল না। কালিকটে এসে আরব বণিকদের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি চমকে উঠলেন। আরও দেখলেন এরা-যে এখানে এসে শুধু পাকাপোক্তভাবে জায়গা করে নিয়েছে তা নয়, রাজসভার উপরে তাদের যথেষ্ট প্রভাবও রয়েছে। এই আরবী মুসলমানরা তাদের নিকটতম শত্রু। দীর্ঘদিন ধরে তাদের সঙ্গে বিরোধ চলে আসছে। সুদূর ভারতবর্ষে এসেও কি আবার বাণিজ্য নিয়ে তাদের সঙ্গেই ঠোকাঠুকি করে চলতে হবে?

আরও একটা ভুল ধারণা ছিল তাদের। রোমের পোপের মত তারাও মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। সেই জন্য কালিকটের একটা হিন্দু মন্দিরকে গীর্জা মনে করে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই ভুলটা ভাঙ্গতে বেশী দেরী হয় নি। এই প্রাথমিক সফরের মধ্য দিয়ে কালিকটের

অবস্থাটা ভাস্কো দ্য গামা ভাল করেই সমঝে নিলেন। এর পর দেশে ফিরে গিয়ে রাজা ডোম ম্যানুয়েলের কাছে সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

পোর্তুগালরাজ এবার প্রকৃত অবস্থা-সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলেন। বোঝালেন, ভারতবর্ষের মসলার বাণিজ্যকে করায়ত্ত করতে হলে তাঁদের মারাত্মক শত্রু ঐ সমস্ত আরবীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সেই সংকল্প নিয়েই কালিকটের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় অভিযান পাঠানো হোল'। এই বহরে ৩৩টি জাহাজ ছিল। জাহাজগুলোর মধ্যে পণ্য দ্রব্যের পরিবর্তে ১৫০০ শো যোদ্ধা আর প্রচুর যুদ্ধসামগ্রী ছিল। অভিযানের নেতা ছিলেন পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল। তাদের উপর আদেশ ছিল, তোমরা কালিকটে গিয়ে জামোনিরনের কাছে একটি বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপনের জন্য এবং পাঁচজন পাদ্রীর ধর্মপ্রচারের জন্য অনুমতি দাবি করবে। জামেরিন যদি তাতে সম্মত না হয়। তবে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে তাকে পথে আনবে।

ক্যাব্রাল ছয়টি জাহাজ নিয়ে কালিকটের ঘাটে এসে পৌছলেন। বাকী জাহাজগুলো পেছনে দৃষ্টির বাইরে থেকে গেল।

জামোরিন ক্যাব্রালকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাকে বাণিজ্য করবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ ও নিয়মসম্মতভাবে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে তারা এখানে আসে নি! তাদের উদ্ধত ব্যবহার স্থানীয় লোকদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ক্যাব্রালের একজন সহকারী ছিল, তার নাম কোরিয়া। এই কোরিয়া একদিন এক হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তুলল। মানুষ এদের ব্যবহারে এমনিতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল; দেখতে দেখতে এই হাঙ্গামা গুরুতর আকার ধারণ করল। এর ফলে কোরিয়া এবং তাদের দলের আরো পঞ্চাশ জন লোক নিহত হয়।

এই ঘটনা ঘটবার পরেই ক্যাব্রাল তার জাহাজগুলোকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নগরের উপর কামান দাগতে শুরু করলেন। এই বর্বর আক্রমণকে প্রতিরোধ

boidownload.com

boidownload.com

করার জন্য জামেরিন ১৫০০ শো যোদ্ধাসহ ৮০টা জাহাজ পাঠালেন। কালিকটের জাহাজগুলোকে তাড়া করে আসতে দেখে ক্যাব্রাল তার জাহাজগুলোকে নিয়ে ভেগে পড়লেন। এখান থেকেই মসলা যুদ্ধের শুরু। কিন্তু কালিকট থেকে সরে পড়লেও পোর্তুগীজরা ভারত মহাসাগর ছেড়ে চলে যায় নি। এবার তারা নতুন মূর্তি ধরে আসরে নামল।

রাজা ডোম ম্যানুয়েল আপনাকে ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতের নৌ-চলাচল, রাজ্যজয়ের ও বাণিজ্যের প্রভু বলে ঘোষণা করলেন। এ শুধু কথার কথাই নয়, এই প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পোর্তুগাল রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

পৃথিবীর সকল দেশেই বণিকেরা প্রাচীনকাল থেকে বাণিজ্য করে আসছে। কিন্তু ইতিপূর্বে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। পোর্তুগীজরা এরকম ঘটনার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে ছিল। ডোম ম্যানুয়েল তো আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, কামানের গর্জন আমাদের দাবি আদায় করে নেবে। আর ধর্মনেতা রোমের পোপ এজাতীয় ব্যাপারে পোর্তুগীজদের উপর তাঁর পবিত্র আশীর্বাদ ঢালাও ভাবে বর্ষণ করে গেছেন। নতুন যুগে নতুন বণিকজাতি বাণিজ্যের এ এক নতুন পথ উন্মুক্ত করে দিল। এ বিষয়ে পোর্তুগীজরাই প্রথম পথ-স্রষ্টা। ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকরা তাদের অনুসরণ করে পঙ্গপালের মত এই ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছিল। এবারকার অভিযানের অধিনায়ক ভাস্কো দ্য গামা। এই বহরে ১৫টা জাহাজ ছিল। তার মধ্যে ছয়টা বড়। শুধু আয়তনেই বড় নয়, শক্তিতেও বড়, অর্থাৎ আগেকার জাহাজগুলোর চেয়ে তাদের গোলাগুলি কামানের পরিমাণ অনেক বেশী। এই অভিযানে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ৮০০ সৈন্য ছিল। কালিকটের পক্ষ থেকে প্রবল প্রতিরোধ আসবার সম্ভাবনা আছে একথা মনে করে এদের সাহায্যের জন্য পাঁচ মাস বাদে আরও পাঁচটা জাহাজ পাঠানো হয়েছিল। রাজা ডোম ম্যানুয়েল আপনাকে নৌ-চলাচলের প্রভু বলে

ঘোষণা করেছিলেন। ভাস্কো দ্য গামা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করলেন। আসতে আসতে যে-কোন জাহাজের সঙ্গে দেখা হোল, কোন রকম হাঁশিয়ারী না দিয়েই তিনি তাদের আটক করে তাদের মালপত্র লুটপাট ও ধ্বংস করতে লাগলেন। এ তো বর্বর জলদস্যুদের কাজ। কিন্তু মহামান্য পোপের বিধান-অনুযায়ী পোর্তুগালরাজ জলরাজ্যের অধিপতি। কাজেই তিনি যাই করুন না কেন তাকে জলদস্যু কখন বলা চলে না।

সেই থেকেই ভারত মহাসাগরের বুকে ভাস্কো দ্য গামা আর তার সহচরদের নৃশংস যথেচ্ছাচার অব্যাহত গতিতে চলল। সেই নিষ্ঠুর ও করুণ কাহিনীগুলোকে ইতিহাস ধরে রাখতে পারে নি। সেই অগণ্য কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। ভাস্কো দ্য গামার কীর্তি-কাহিনীর স্বরূপ এই থেকেই বোঝা যাবে।

মক্কা থেকে হজ-যাত্রীদের নিয়ে কয়েকটা নিরস্ত্র জাহাজ ফিরে আসছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা পোর্তুগীজ জাহাজের সামনে পড়ে গেল। জাহাজগুলোকে আটক করে তাদের মধ্যে মালপত্র যা ছিল, সব কিছু তুলে এনে জাহাজগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু ভাস্কো দ্য গামার কড়া আদেশ ছিল, জাহাজে যে-সমস্ত আরবী আছে, তাদের যেন তুলে আনা না হয়। হতভাগ্য আরবীরা সেই জাহাজের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে মরল। ভাস্কো দ্য গামা পরম আনন্দে সেই দৃশ্য উপভোগ করলেন।

মহাসমুদ্রের বুকে নৌ-চলাচলের অবাধ অধিকার সকলেরই আছে। এই অবস্থায় ভাস্কো দ্য গামা এই সমস্ত জাহাজগুলোকে আটক, বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করে কি ন্যায়সংগত কাজ করেছিলেন? এ প্রশ্ন অনেকেই তুলেছিলেন। কিন্তু ভাস্কো দ্য গামার পক্ষ সমর্থন করে ওকালতি করবার মত লোকের অভাব ছিল না। তারা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, একথা সত্য, সমুদ্রের বুকে নৌ-চলাচল করার ব্যাপারে সকলেরই সমান অধিকার আছে এবং ইউরোপে আমরা

boidownload.com

সকলেই এই অধিকারকে স্বীকার করে থাকি। কিন্তু এই অধিকারের সীমা ইউরোপের মধ্যেই, তার বাইরে নয়। কাজেই সমুদ্রের প্রভু পৌর্তুগীজদের নিকট থেকে অনুমতি না নিয়ে যারা নৌ-চলাচল করতে যায়, তাদের মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে নেবার যুক্তিসংগত অধিকার পোর্তুগীজদের আছে।

শুধু পোর্তুগীজই নয় ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সবাই তাদের প্রয়োজনের সময় অকুণ্ঠচিত্তে এই যুক্তি প্রয়োগ করে এসেছে। ইতিহাসের দলিলপত্রে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। শোষণের প্রয়াোজনের তাগিদে শুধু বিবেক নয়, তারা সাধারণ চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। এই যুক্তিকে তারা শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তারা সবাই খোলাখুলিভাবেই একথা বলে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন? সে তো ইউরোপের জাতিগুলোর নিজেদের ভেতরকার ব্যাপার। লণ্ডন বা প্যারিসে যা বর্বরতা বলে আখ্যা পায়, পিকিং-এর বুকে তাকেই সভ্যজনোচিত আচার বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডে আফিং সেবন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ, কিন্তু চীনের আইন লঙ্ঘন করে তাদের দেশে আফিমের ব্যবসা চালু করবার জন্য চাপ দিতে ইংরাজের বিবেকে এতটুকু বাধে নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হংকং চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘোষণা করলেন, আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা আবদ্ধ বলে প্রত্যেক সভ্য জাতিই কতকগুলো অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, কিন্তু তাই বলে চীন-সম্বন্ধে সেকথা প্রযোজ্য হতে পারে না।

ভাস্কো দ্য গামা কালিকটে এসে পৌছবার আগেই তাঁর দস্যু-বৃত্তির কাহিনী সেখানে পৌছে গিয়েছিল। এই সমস্ত খবর শুনে সমস্ত নগরে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে হজ-প্রত্যাগত যাত্রীদের পুড়িয়ে মারবার সংবাদটা কি মুসলমান কি হিন্দু সবার মনেই পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এরা কি মানুষ না পশু, অবাক হয়ে সেকথাই ভাবছিল তারা। কিন্তু মানুষই হোক, আর পশুই হোক এদের প্রতিরোধ তো করতেই হবে।

boidownload.com

তা তো হবে, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল, কিন্তু ওদের-যে কামান আছে, আর সে কামান সত্য সত্যই আগ্নিবর্ষণ করে। এ তো আর শোনা কথা নয়, নিজের চাোখেই তারা দেখেছে কি ভয়ানক সেই দৃশ্য! আগুনের গোলাগুলো লাফিয়ে এসে পড়ে, ভেঙ্গে যায়, আর চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

কিন্তু কি হোল শেষ পর্যন্ত? ক্যাব্রাল পারলেন তাদের সঙ্গে? কি করল ওদের কামান? শেষকালে ক্যাব্রাল তো কোনমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

কথা ঠিক, সবাই সে কথা সমর্থন করল। কিন্তু তবু মনের মধ্যে কত রকম আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠতে থাকে। তারা আফসোস করে বলল, আহা আমাদের যদি কামান থাকত!

আরব বণিকেরা শুধু বাইরে থেকেই এখানে বাণিজ্য করতে আসে না। অনেক আরব বণিক এখানে বাণিজ্য করতে এসে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। এখন কালিকটকেই তারা তাদের স্বদেশ বলে মনে করে। কালিকটের হিন্দু বণিক, আরব বণিক, সবাই এই দুর্দিনে একমন হয়ে দাঁড়ালেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন ওই পোর্তুগীজ দস্যুরা যদি জয়লাভ করতে পারে, তবে সর্বপ্রথমেই তারা এখানকার বণিকদের উৎসন্ন করে তাদের জায়গা দখল করে বসবে। এদেশের কাউকে আর বাণিজ্য করে খেতে হবে না। তারা সংকল্প নিল. এই বিদেশী আক্রমণকারীদের বিতারিত করবার জন্য, তারা ঐকবদ্ধ হয়ে রাজার পেছনে দাঁড়াবে। তাদের এই দৃঢ়-সংকল্প শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। বিদেশী চক্রীরা নানাভাবে চেষ্টা করেও তাদের এই ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে নি।

জামোরিন বুঝতে পেরেছিলেন সামনে অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষায় পৌঁছোবার উপায় নেই। পোর্তুগীজ বণিকদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বুঝতে তাঁর বাকী ছিল না। আর একথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই যুদ্ধ একদল বণিকের বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং পোর্তুগাল-রাজের নির্দেশেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। এ সম্বন্ধে আরব বণিকরা তাকে প্রথমেই সর্তক করে দিয়েছিল। তবু তিনি পোর্তুগীজ

boidownload.com

বণিকদের সঙ্গে যথাসম্ভব ভাল ব্যবহার করেই আসছিলো। যাতে সকলের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলা যায়, সেই ভাবে কাজ করাই তার চিরদিনের নীতি। দীর্ঘদিন ধরে শান্তি অব্যাহত আছে বলেই এখানকার বাণিজ্যের এত উন্নতি হয়েছে। আর বাণিজ্যের উন্নতির ফলে এই রাজ্যের এমন সমৃদ্ধি। এইজন্যই তিনি প্রথমে পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে আরব বণিকদের হুঁশিয়ারীটা তত গায়ে মাখেন নি।

কিন্তু এত ভাল ব্যবহারের প্রতিদানে ওদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পান নি কখনও। ওদের ব্যবহার উদ্ধত, চালচলন অসংযত, আর ওদের কার্যকলাপ পদে পদেই ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটিয়েছে। তারপর ক্যাব্রেল যখন নগর ধ্বংস করবার জন্য কামান দাগলেন, তখন তিনি বুঝলেন, বৃথা চেষ্টা, শুধুমাত্র এক পক্ষের চেষ্টায় শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। ও পক্ষ-যে শান্তি ভঙ্গ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই মারমুখো হয়ে এসেছে। তখন থেকেই তিনি আত্মরক্ষার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর তুলনায় কালিকটের জাহাজ সংখ্যা অনেক বেশী। তা হলেও তিনি আরও নতুন নতুন জাহাজ নির্মাণ করতে লাগলেন।

ভাস্কো দ্য গামার সংবাদ এসে পৌছবার পর জামোরিন নগরের বণিকদের ডাকিয়ে এনে বললেনঃ আপনাদের জন্যই কালিকটের এত সমৃদ্ধি, দেশবিদেশে এত প্রতিষ্ঠা। এই দুঃসময়ে আমি আপনাদের উপর ভরসা করে বসে আছি। এই সংকট থেকে যাতে দেশকে মুক্ত করতে পারি, আপনারা সে বিষয়ে সাহায্যে করুন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বণিকেরা বলে উঠলেন, এ তো আমাদের কর্তব্য। আমাদের যথাসাধ্য আমরা অবশ্যই করব।

জামোরিন প্রত্যাশা ভরা দৃষ্টি নিয়ে বৃদ্ধ আরব বনিক খোজা আম্বরের মুখের দিকে তাকালেন। খোজা আম্বর কালিকটের সবচেয়ে বড় বণিক। শুধু

boidownload.com

বণিক হিসেবেই তিনি বড় নন, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার জন্য তিনি নগরের সম্মানিত বণিকদের মধ্যে অন্যতম।

জামোরিনের চোখে যেই প্রশ্ন ছিল, যেন তার উত্তর দিয়েই খোজা আম্বর বিনয় সহকারে বললেনঃ আমর কিইবা আছে, আর কিইবা আমি দিতে পরি? তবে এইটুকু আমি বলতে পারি, আমার যে-সমস্ত জাহাজ আছে, আমি তার সবগুলোকেই আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি প্রয়োজন বুঝে এগুলোর সদ্ব্যবহার করুন।

বণিকেরা ধন্য ধন্য বলে বৃদ্ধ খোজা আম্বরকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর তারা সবাই রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আর বেশী কথা বলার দরকার কি? আপনি আমাদের যার কাছে যখন যা চাইবেন, আমরা অকুণ্ঠচিত্তে তাই দেব। জামোরিন প্রীত হয়ে বললেন, আপনারা আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন। কিন্তু চিন্তা করবার মত অনেক কিছুই ছিল। একজন আরব বণিক বললেন, এ তো হোল, কিন্তু আমাদের- যে একটা কামানও নেই। আমাদের সৈন্যরা কামানের বিরুদ্ধে কি দিয়ে লড়াই করবে? অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন! কিন্তু এর উত্তরে বলার মত কিছুই তার ছিল না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। একথাটা ভেবে দেখতে হবে আমাদের।

কিন্তু একথা ভেবে দেখবার মতো সময় কোথায় তখন? সেই দিনই চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল, ভাস্কো দ্য গামার বহর কোচিনের কাছাকাছি এসে পৌছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই পরামর্শ সভা বসল। নৌ-সেনাপতি কাশিম বললেন, আমরা ওদের আমাদের বন্দরের কাছে আসতে দেব না, এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করব।

তাই স্থির হোল। কোচিনের কাছে কালিকটের যুদ্ধবহর পোর্তুগালের যুদ্ধবহরের সঙ্গে মোকাবিলা করল।

boidownload.com

boidownload.com

কিন্তু এর নাম যুদ্ধ? একদিকে পোর্তুগীজদের জাহাজ থেকে কামানগুলো অগ্নি উদগিরণ করে চলেছে। অপর দিকে কালিকটের জাহাজে আস্ত্রের ঝঞ্চনা। ঢাল, তারোয়াল দিয়ে কি আর কামানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলে? চলুক আর নাই চলুক, যুদ্ধ কিন্তু চলল। খোজা আম্বরের ভারী ভারী জাহাজগুলো কামানের গোলার ঘায়ে জখম ও অচল হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু কালিকটের নৌ-সেনাপতি কাশিম সেদিন যে-রণচাতুর্য প্রদর্শন করলেন, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি তাঁর ছোট ছোট জাহাজগুলোকে এমন কৌশলের সঙ্গে পরিচালিত করছিলেন যে, ওরা কিছুতেই তাদের উপর কামান দাগতে পারল না। এই ক্ষিপ্রগতি হালকা জাহাজগুলো পোর্তুগীজদের জাহাজগুলোকে বোলতার মত ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরে ফেলল। এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ভাস্কো দ্য গামার জীবনে আর কখনও বোধ হয় নি। তিনি এদের হাত থেকে কোনমতে অব্যাহতি পেয়ে যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। এ যুদ্ধের-এ এমন পরিণতি ঘটতে পারে, একথা ভাবা খুবই কঠিন। এর পর ভাস্কো দ্য গামার নাম আমরা আর শুনতে পাই নি।

পাঁচ

ভাস্কো দ্য গামার যুদ্ধবহরকে হটিয়ে দিলেও কালিকটের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে নি। তারা বুঝতে পেরেছিল, পোর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ এইখানেই শেষ নয়, সবেমাত্র শুরু। দুর্ধর্ষ পোর্তুগীজরা বহরের পর বহর পাঠাতে থাকবে, কতদিন পর্যন্ত তাদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

কালিকট কোনদিনই এই নৌ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশবিদেশের বণিকরা এই বন্দরে পণ্যের লেন-দেন করে আসছে, মিশরীরা এসেছে, গ্রীকরা এসেছে, রোমকেরা এসেছে, আরবীরা এসেছে, চীনারা

এসেছে, ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে বণিকরা এসেছে, কিন্তু বাণিজ্য নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা কেউ কোনদিন শোনে নি। কালিকটের জাহাজের মধ্যে বেশীর ভাগই বাণিজ্য—জাহাজ, তবে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ বলে আত্মরক্ষার জন্য কিছু কিছু যুদ্ধজাহাজও তাদের ছিল। কিন্তু সেগুলো উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধ করবার পক্ষে উপযোগী। শত্রুদের জাহাজ যখন উপকূল ছেড়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রবেশ করে, কালিকটের যুদ্ধজাহাজের নাবিকরা তখন নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় ভয়ের কথা ওদের কামান। দূর থেকে ওরা অগ্নিবর্ষণ করে চলে। তার বিরুদ্ধে কি করতে পারে এরা? ভাস্কো দ্য গামা যেতে না যেতেই চৌদ্দটা জাহাজের আর একটা বহর কালিকটের সমুদ্রকে আলোড়িত করে তুলল। এই বহরের অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন লোপো সোর্‌স। লোপো সোর্‌স ঝানু ও বিচক্ষণ নৌ-যোদ্ধা। মম্মলির নেতৃত্বে কালিকটের এক বহর যুদ্ধ-জাহাজ ক্রাঙ্গানোরে নোঙর ফেলে অবস্থান করছিল। এ অবস্থায় তাদের উপর যে-কোন রকম হামলা হতে পারে এটা এদের চিন্তার মধ্যে ছিল না। লোপো সোর্‌স তাদের এই নিশ্চিন্ততার সুযোগ নিয়ে ঝটিকা আক্রমণ করে বসল। তার কামানের গোলায় জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। আর একটা বন্দরে কতগুলো বাণিজ্য—জাহাজ জড় করা ছিল। কতগুলো যুদ্ধ-জাহাজ তাদের রক্ষা করবার জন্য পাহারা দিচ্ছিল। এখানে দুপক্ষে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। কিন্তু পোর্তুগীজদের কামানের গোলার সামনে কতক্ষণ তারা দাঁড়াবো! দেখতে দেখতে তাদের রক্ষাব্যুহ ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কলিকটের জাহাজগুলোর অপরিমিত ক্ষতি ঘটল।

কামান-যে কত বড় শক্তি কালিকট এবার তা হাড়ে হাড়ে বুঝল। জামোরিন দেখলেন, এভাবে যুদ্ধ চালানো কোনমতেই সম্ভব নয়। আরব বণিকরা পরামর্শ দিল, মিশরের সুলতানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। ওদের হাতে কামান আছে। গোলন্দাজবাহিনী যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে পোর্তুগীজদের

boidownload.com

আমরা দেখে নিতে পারব। জামোরিন তাদের এই পরামর্শ মেনে নিলেন। মিশরের সুলতানের সঙ্গে জামেরিনের অনেকদিন থেকেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক চলে আসছিল। তা ছাড়া কালিকটের মসলার বাণিজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা লুটে আসছিল মিশরের বণিকরা। মিশরের সমৃদ্ধি প্রধানত তার উপর নির্ভর করছিল। এই মসলার বাজার যদি পোর্তুগীজদের দখলে চলে যায়, তবে তার ছিটেফোটাটুকুও আর তাদের ভোগে আসবে না।

মিশরের সুলতান এই সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিলেন। দেড় হাজার যোদ্ধা আর কামান বোঝাই এক মিশরী বহর আরব সাগরে এসে উপস্থিত হোল। প্রাচীন সেনাপতি মীর হুসেন এই অভিযানের অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন। মীর হুসেন দিউ দ্বীপে ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। এটা ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এখান থেকে যাত্রা করে জামোরিনের নৌ-বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে পোর্তুগীজদের আক্রমণ করবেন।

সে সময় পোর্তুগীজরা কোচিনের উপকূলে স্থায়ী ঘাটি পত্তন করে বসেছিল। তাদের রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তার নাম ছিল ডন ফ্রান্সেসকো দ্য আলমেইডা।

পরিকল্পনা-অনুযায়ী মীর হুসেন ও জামোরিনের নৌ-বাহিনী মিলিত হয়ে কোচিনের দিকে যাত্রা করলেন। এ সমস্ত খবর পোর্তুগীজদের কাছে আগেই পৌছে গিয়েছিল। তাদেরও আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। শাসনকর্তার পুত্র লোরেনকো দ্য আলমেইডার নেতৃত্বে পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনী তাদের মোকাবিলা করবার জন্য কোচিন ছেড়ে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। কালিকট আর কোচিনের মাঝামাঝি চাওল নামে একটি স্থান ছিল। তারই কাছে দুপক্ষে সংঘর্ষ বাধল। এবার যুদ্ধ হোল সামনে সামনে, দুপক্ষের হাতেই কামান ছিল। আরব সাগর এই প্রথম এক নতুন ধরনের যুদ্ধ দেখল। দুদিন ধরে উভয় পক্ষে গোলাবর্ষণ চলল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক বুঝে পোর্তুগীজরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। কিন্তু যে—

boidownload.com

জাহাজে সেনাপতি ছিলেন, কামানের গোলায় তা ঘায়েল হয়ে পড়ল। জাহাজটা বিধ্বস্ত হল শুধু এই নয়, সেনাপতি নিজেও নিহত হলেন।

পোর্তুগীজরা চোখে অন্ধকার দেখল। ডোম ম্যানুয়েলের এত স্বপ্নসাধ সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলে গিয়েও-যে কামানে কামানে লড়াই করতে হবে, এটা তারা ভাবতে পারে নি। ভেবেছিল তাদের হাতে থাকবে কামান, আর অপর পক্ষের হাতে ঢাল, তলোয়ার, বল্লম, বর্শা, সড়কি। হাসতে হাসতে যুদ্ধ জয় করে নেবে। কিন্তু আপাতত সে ইচ্ছা পূর্ণ হোল না।

কিন্তু শাসনকর্তা ডন ফ্রান্সেসকো দ্য আলমেইডা উদ্যোগী পুরুষ। চাওলের পরাজয় তাঁর মন ভেঙ্গে দিতে পারল না। নতুন উদ্যোগ নিয়ে তিনি আবার শক্তি সংগ্রহ করতে লাগলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হোল। তখন তাঁর হাতে আঠারোটা জাহাজ আর বারো শো যোদ্ধা। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মিশরী বহরের ঘাঁটি দিউর সামনে এসে রণডঙ্কা বাজালেন।

কিন্তু এবার আর অস্ত্র হিসেবে শুধু কামানই ছিল না, তার চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম ও কুটিল অস্ত্র প্রয়োগ করলেন তিনি। দিউ দ্বীপ গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত। মালিক আয়াজ নামে এক ব্যক্তি গুজরাটের সুলতানের প্রতিনিধি হয়ে দিউ দ্বীপ শাসন করছিল। মালিক আয়াজ গোপনে পোর্তুগীজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় মালিক আয়াজ সমস্ত রকম রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল। রসদ অভাবে মীর হুসেন কঠিন সংকটের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিন্তু তা হলেও তিনি যুদ্ধ করাই সিদ্ধান্ত করলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে উভয় পক্ষ যুদ্ধে নামল। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কোন মীমাংসা হোল না। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারল না। এর অল্প কিছুদিন বাদেই মীর হুসেন গুজরাটের সুলতানের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হয়ে সমস্ত জাহাজ নিয়ে তার দেশে ফিরে গেলেন।

boidownload.com

পোর্তুগীজদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোল। তারা কালিকটকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। পোর্তুগীজদের সঙ্গে নৌ যুদ্ধ পরিচালনা করবার মত কোন শক্তি রইল না আর। কিন্তু মীর হুসেন শত্রুর শেষ না করে স্থায়ী ভাবে মিশরে ফিরে গিয়ে যে-অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন সেদিন, মিশরকে একদিন সেজন্য খুবই অনুশোচনা করতে হয়েছিল। কেননা পোর্তুগীজ তো শুধু কালিকটেরই শত্রু নয়, সে তো মিশরেরও শত্রু।

ছয়

মীর হুসেন তাঁর কামানবাহী জাহাজগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার পর পোর্তুগীজরা সত্যসত্যই প্রাচ্য অঞ্চলের সমুদ্রগুলোর একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে দাঁড়াল। সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবার মত কোন শক্তিই রইল না।

নৌ-শক্তিকে কিছুতেই ধ্বংস করতে পারে নি তারা। উভয় পক্ষে বহু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে। কিন্তু কালিকটের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। সেই দুর্দিনে কালিকটকে সাহায্য করবার মত আর কেউ ছিল না। শুধু ছিল তাদের দুর্জয় সংকল্প আর তার হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের মিলিত প্রতিরোধ। পোর্তুগীজদের আক্রমণের তরঙ্গ বার বার তার কুলে এসে ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু বার বারই তাকে প্রতিহত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। ১৫০৯ থেকে ১৫৯৯, এই ৯০ বছরের ইতিহাস দুর্দম প্রতিরোধের ইতিহাস। এই কালিকটে পোর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের ভূমি স্পর্শ করেছিল, এই কালিকটের সঙ্গে, জলে-স্থলে বহুবার শক্তি পরীক্ষা করতে হয়েছে তাদের, কিন্তু কালিকট অধিকার করা কোনমতেই সম্ভব হয়ে উঠল না। শুধু তাই নয়, কালিকটের কাছ থেকে বাধা

boidownload.com

পেয়ে মালাবারের সমুদ্র উপকূলে কোথাও তারা ঘাটি গেড়ে বসতে পারে নি। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দুপক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়।

কিন্তু তা হলেও যে-উদ্দেশ্যে ওরা ভারতবর্ষে এসেছিল, তা অপূর্ণ রইল না। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এমন কি প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল। ফলে মসলার বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতে এসে গেল। দেড় শো বছর পর্যন্ত মসলার বাণিজ্য তাদের মুঠোর মধ্যেই ছিল। এই দেড় শো বছর ধরে পোর্তুগাল সমস্ত ইউরোপময় একচেটিয়া ভাবে মসলার ব্যবসা করে চলেছে।

পোর্তুগীজদের এই সমুদ্রে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী, তার নাম এফনসে অ্যালবুকার্ক। অ্যালবুকার্ক ১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে এখানে আসেন। এই সময় ত্রিস্তান দ্য কুনহার নেতৃত্বে পোর্তুগীজদের একটি বাহিনী লোহিত সাগরের বণিকদের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালায়। অ্যালবুকার্ক এই বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। ডন ফ্রান্সেসকো দ্য আলমেইডার পরে তিনি পোর্তুগীজদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

অ্যালবুকার্কের প্রথম লক্ষ্য হোল একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা। সেখান থেকে তিনি সমস্ত সমুদ্রগুলোর উপর অপ্রতিহত প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারবেন। সে সময় পোর্তুগীজদের একমাত্র দুর্গ ছিল কোচিনে। তাও কোচিনের উপকূলে নয়। এই দুর্গ ছিল ছোট একটি দ্বীপের মধ্যে। সেই দ্বীপের আয়তন বর্গ মাইলের মত। অ্যালবুকার্ক বললেন, না, এ দুর্গ দিয়ে চলবে না। তাঁর দৃষ্টি ছিল কালিকটের দিকে। পোর্তুগীজদের জলদস্যুতাসত্তেও কালিকট তখনও মসলা বাণিজ্যের বড় বন্দর। এই দেশে ঘাঁটি করে বসতে পারলে পোর্তুগীজদের সবদিক দিয়ে সুবিধা। ওদিকে পোর্তুগালরাজ ডোম ম্যানুয়েল গর্জচ্ছেন, তোমরা করছি কি? সামান্য একটা কালো মানুষের দেশ, তার কাছে বার বার ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে, কি লজ্জার কথা! তার সবচেয়ে বড় সামরিক অফিসার যিনি, সেই গ্র্যাণ্ড

boidownload.com

মার্শাল অব পোর্তুগালকে তিনি দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন ভারতবর্ষে। তার সঙ্গে নির্দেশ এল, যেমন করে পার, জামেরিনের শক্তি চূর্ণ করে কালিকট অধিকার করে নাও।

সবাই বলল, ঠিক কথা। কালিকট অধিকার করতেই হবে। পোর্তুগালের মানমর্যাদাকে কি সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিয়ে যাব আমরা? সিদ্ধান্ত হোল, ঝটিকা আক্রমণ করতে হবে, কালিকট যাতে প্রস্তুত হবার সময়টুকু না পায়। পৃথক পৃথক ভাবে দু'টি বহর সাজানো হোল। একটির নাম "ফ্লিট অব পোর্টুগাল"। স্বয়ং মার্শাল তার পরিচালক। অপরটিকে শাসনকর্তা অ্যালবুকার্ক পরিচালিত করবেন।

এই বহরের নাম "ফ্লিট অব ইণ্ডিয়া"। বহু সৈন্য তাঁদের সঙ্গে ছিল কালিকট নামতে বেশী বেগ পেতে হোল না তাদের। এবার আর নৌ-যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ স্থলভূমিতেই হোল! কালিকাটির যোদ্ধারা অদ্ভুত রণপ্রতিভার পরিচয় দিল সেদিন। পোর্তুগীজরা এমন কথা কল্পনাও করতে পারে নি। চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। তাদের। বহু পোর্তুগীজ সৈন্য মারা পড়ল। স্বয়ং গ্র্যাণ্ড মার্শাল অব পোর্টুগাল আর তার ৭০ জন বিশিষ্ট সহচর এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। আর অ্যালবুকার্ক বা হাতে ও ঘাড়ে গুরুত্বর আঘাত পান। কামানের গোলার ঘায়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়লে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় জাহাজে তুলে নিয়ে যায়। শেষের এই সংবাদটুকুর মধ্য দিয়েই প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে কালিকটে কামান এসে গেছে। কালিকটে এই প্রথম স্থল যুদ্ধ। এইভাবেই তার পরিণতি ঘটল।

কালিকটের কাছে দুর্ধর্ষ পোর্তুগীজদের এই চূড়ান্ত পরাজয় সে যুগের এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পোর্তুগীজ বাহিনীকে পরিচালিত করেছিলেন স্বয়ং গ্র্যাণ্ড মার্শাল। কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে পোর্তুগীজরা কালিকটের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল, সে কথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যে একটিও এই চরম দুর্দিনে কালিকটের পাশে এসে দাঁড়ায় নি। তবু কেমন করে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটাল ভাবলে অবাক

boidownload.com

হয়ে যেতে হয়। নির্ভীক দেশপ্রেম আর আক্রমণকারী নৃশংস শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাড়া আর কি তাদের সম্বল ছিল? আর সেই দেশপ্রেম এতই গভীর যে, তার সামনে হিন্দু আর আরবীর ভেদ-বুদ্ধি তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে গেল। দীর্ঘদিন ধরে এই ঐক্যকে তারা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছিল, ধন্য তাদের দেশপ্রেম।

প্রাচ্যের বুকে ঔপনিবেশিকবাদের সেই প্রথম পদপাত কালিকটকে সর্বপ্রথম মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার সঙ্গে কালিকটের বীর অধিবাসীরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে চলেছিল। সেখান থেকেই সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রাম শুরু। তারপর কত শতাব্দী ধরে দেশে দেশে সেই সংগ্রাম চলে আসছে। আজও সেই সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় নি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এই শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে কালিকটের সেই বীরদের কথা স্মরণ করে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

কালিকট যখন পোর্তুগীজদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো তখন কি করছিল? পোর্তুগীজদের সম্পর্কেই বা তাদের কি মনোভাব ছিল?

উত্তরে তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তারিত বিশাল হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর। তারই একপাশে আরব সমুদ্রের উপকূলে ছোট্ট কালিকট রাজ্য। তুঙ্গভদ্রার উত্তরে এককালের বাহামনী রাজ্য ভেঙ্গে বেরাব, আহমদনগর, বিদর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এই পাঁচটি মুসলমান রাজ্য গঠিত হয়। তারও উত্তরে তিনটি মুসলমান রাজ্য গুজরাট, মালব ও খান্দেশ। এর মধ্যে গুজরাট, আহমদনগর, বিজয়নগর ও কালিকট এই ক'টি রাজ্য আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। সেইজন্যই পোর্তুগীজদের আক্রমণের সঙ্গে এদের সকলের স্বার্থই অল্পাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট।

বিজয়নগরের উত্তরে এই সব ক'টা দেশই মুসলমান রাজ্য। সেইজন্যই তার মুসলমান আতঙ্ক এত বেশী যে, যা কিছু ইসলাম-বিদ্বেষী তাকেই তার বন্ধু

boidownload.com

বলে মনে হয়। এই সূত্র অন্ধের মত অনুসরণ করে চললে সময় সময় স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে হয়। এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পোর্তুগীজরা মুসলমান-বিদ্বেষী একথা আগেই বলেছি। এ কথাটা কোথাও প্রচারিত হতে বাকী ছিল না। পোর্তুগীজরা হজযাত্রীদের বহু জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে, একথা সকলেরই জানা ছিল। কাজেই তাদের মুসলমান-বিদ্বেষের তীব্রতা-সম্পর্কে কোনই সন্দেহ করা যায় না। তা ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কে আপাতত নিজের হাতে রাখবার জন্য পোর্তুগীজরা তাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে এ কথাটা প্রচার করতেও চেষ্টা করত। সেই জন্যই বিজয়নগর পোর্তুগীজদের আক্রমণটাকে খুশী মনেই গ্রহণ করেছিল। ভেবেছিল, পোর্তুগীজরা পক্ষে থাকলে উত্তরের মুসলমান রাজ্যগুলো-সম্পর্কে তার ভয় করবার মত কিছু থাকবে না।

পোর্তুগীজরা যখন গোয়া দখন করে বসল, বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় সংবাদটাকে সুসংবাদ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান বিদ্বেষ ছাড়াও খুশী হবার আরও কারণ ছিল। পোর্তুগীজরা গোয়া দখল করবার ফলে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য ঘোড়া আমদানী করার সুযোগ পাওয়া গেল। সেইজন্য রাজা কৃষ্ণদের রায়- যে শুধু মনে মনেই খুশী হলেন তা নয়, পোর্তুগীজদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চললেন। অ্যালবুকার্ক তাঁর রাজ্যের ভাটকল নামক স্থানে একটা বাণিজ্য কুঠি গড়বার জন্য রাজার কাছে অনুমতি চাইলেন। রাজা বিনিময়ে কোন কিছু পাওয়ার আশা না রেখে জায়গাটা এমনিতেই ছেড়ে দিলেন তাকে। অথচ ঠিক সেই সময় পোর্তুগীজদের সঙ্গে হিন্দুরাজ্য কালিকটের কথা মনে করে হিন্দু রাজা কৃষদের রায়ের মন একটুও বিচলিত হোল না।

তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীর থেকে শুরু করে গুজরাট পর্যন্ত যে-ক'টা মুসলমান রাজ্য আছে, পোর্তুগীজদের আক্রমণের উত্তরে তাদের দিক থেকেও কোন টুঁ টাঁ শব্দ উঠল না। অথচ পোর্তুগীজদের মুসলমান-বিদ্বেষের কথা তারা তাে ভাল

boidownload.com

boidownload.com

করেই জানত। তা ছাড়া গুজরাট বাণিজ্যের দেশ। ক্যাম্বে, সুরাট আর চাওল এই তিনটি বন্দরে বহু বাণিজ্য জাহাজ। এই বাণিজ্যই গুজরাটের প্রধান নির্ভর। এই বাণিজ্যের চাকিকাঠি যদি পোর্তুগীজদের হাতে চলে যায়, এখানকার বণিকদের উপায় হবে কি? এখানকার বণিকেরা কালিকট বন্দর থেকে মসলা এনে তাই নিয়ে দেশে দেশে ব্যবসা করে বেড়াত। তা ছাড়া উত্তর ভারতের নানারকম পণ্য এই বন্দর দিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে রপ্তানি হোত।

এই পোর্তুগীজ পঙ্গপালের দল মসলার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল। এখানকার মসলা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আর সব বাণিজ্যের চাবিকাঠি নিজেদের মুষ্টিগত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল তারা। সেইজন্য স্থলভাগে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিবর্তে বাণিজ্যপথ সমুদ্রে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকেই তারা বেশী মন দিয়েছিল। বাণিজ্য-নির্ভর গুজরাটের সুলতান এ বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন, বলা যায় না। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে এই দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। আমরা আগে দেখেছি, পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কালিকটকে সাহায্য করবার জন্য মিশরের বহর মীর হুসেনের নেতৃত্বে দিউ দ্বীপে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। দিউ দ্বীপ গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত। গুজরাটের সুলতান তাকে বসবার জায়গা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রতিনিধি দিউর শাসনকর্তা মালিক আয়াজ চর, প্রয়োজনের মুহূর্তে পোর্তুগীজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মিশরীয়দের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল। এই বিশ্বাসঘাকতার ফলে বিক্ষুব্ধ মীর হুসেন স্বদেশে ফিরে গেলেন। আর পোর্তুগীজদের পক্ষে তা এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে দাঁড়াল। গুজরাটের সুলতান কি ভেবে এই কাজ করেছিলেন, বলার উপায় নেই। তবে এজাতীয় ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা অনেক সময়ই এই পন্থায় তাদের প্রবেশের পথ সুগম করে নিয়েছে।

কালিকট অধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে অ্যালবুকার্ক এবার গোয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। একটা নির্ভরযোগ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠা করা তাদের পক্ষে অবশ্য

প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোয়া বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত। আরবসাগরের উপকূলে তার অবস্থান।

বিনা যুদ্ধে গোয়া দখল হয়ে গেল, এখানেও সেই বিশ্বাসঘাতকতার খেলা। গোয়ার তুলাজী নামে একজন হিন্দু প্রধান ছিল। তার সাহায্যে অ্যালবুকার্ক গোয়া অধিকার করে বসলেন।

এইভাবে গোয়া দখল করবার পর অ্যালবুকার্ক পোর্তুগালরাজ ডোম ম্যানুয়েলের কাছে এ সম্পর্কে যে-সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, গোয়ায় যে-সমস্ত আরবী ছিল, আমরা তাদের সবাইকে হত্যা করেছি, আমাদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় নি। আমরা তাদের মসজিদের মধ্যে আটকে রেখে, শেষে সেই মসজিদ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি। ধর্মোন্মাত্তকা মানুষকে কোন্ বরবরতার স্তরে টেনে নিয়ে যেতে পারে, তার যেন সীমা নেই। বিশেষ করে বৈষয়িক স্বার্থ বুদ্ধি যদি তার সঙ্গে সিংশ্লিষ্ট থাকে।

সাত

পোর্তুগীজরা গোয়াকে সুরক্ষিত নগরে পরিণত করল। ১৫১০ খৃস্টাব্দে তারা গোয়া অধিকার করেছিল। গোয়ার দুর্ভেদ্য দুর্গ তাদের দিগন্ত-বিস্তারিত সমুদ্র সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল।

এবার অ্যালবুকার্কের শিকার-সন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর দিকে নিবদ্ধ হোল। তাঁর কর্মসূচী পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। এতদিন তার বাণিজ্যতরী ও রণতরী ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও লোহিত

boidownload.com

সাগরের মধ্যেই চলাচল করত। এবার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অশান্তির আলোড়ন জাগিয়ে তুলল।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের আধুনিক নাম ইন্দোনেশিয়া। এইগুলোর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। দ্বীপগুলো মসলার জন্য বিখ্যাত। প্রাচীনকাল থেকে এদের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ চলে আসছিল। বহু শতাব্দী আগে ভারতীয়েরা মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোতে, কাম্বোডিয়ায় এবং চম্পা প্রভৃতি স্থানে অনেক উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভারতের বণিকরা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো থেকে জাহাজ বোঝাই করে মসলা নিয়ে আসত, আর তাই নিয়ে দেশে দেশে বাণিজ্য করে ফিরত। ইন্দোনেশিয়ার এই মসলা নিয়ে বাণিজ্য তারা কবে থেকে শুরু করেছিল, সে কথা নির্দিষ্টকরে বলা যায় না। তবে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যেও আমরা তার উল্লেখ পাই। কবি সমুদ্রের ওপারের দ্বীপগুলো থেকে সুগন্ধী মসলায় বোঝাই ভারতীয় জাহাজের বর্ণনা করেছেন । প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ, এই মসলার জন্যই ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারা জানত না এই মসলা শুধু ভারতবর্ষেই জন্মায় না, তার অধিকাংশই আসে ইন্দোনেশিয়া, থেকে।

বহুদিন আগে থেকে এই অঞ্চলে চীনাদেরও যাতায়াত ছিল। কিন্তু মিঙ বংশের রাজত্ব থেকেই নিয়মিত ভাবে জাহাজ চলাচল হতে থাকে : মসলা তাদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ, এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। মিঙ সম্রাট ইয়াংলোর রাজত্বকালে চীনাদের নৌ-অভিযান চরম উন্নতি লাভ করে। বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি চেংহো এই অভিযানের পরিচালক ছিলেন, দোভাষী মাহুয়ান তাঁর এই অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। মাহুয়ানের লিখিত বৃত্তান্ত থেকেই আমরা চেংহোর দক্ষিণ সমুদ্র অভিযানের পূর্ণ বিবরণ জানতে পারি। চেংহোর একটি নৌ-বহরে কমপক্ষে ৬৫টি জাহাজ ছিল। তার মধ্যে কতকগুলো বৃহদাকার জাহাজ ছিল। চেংহো যে, শুধু প্রশান্ত মহাসাগরেই বিচরণ করতেন তা নয়। তার নৌ-বহর

boidownload.com

বহুবার সিংহল, কালিকট, এমন কি এডেন পর্যন্ত গেছে। চেংহোর মৃত্যুর পর চীনাদের নৌ-অভিযানের আর কোন বিবরণ আমরা পাই না।

চেংহোর উপর্যুপরি নৌ-অভিযানের ফলে মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দ্বীপে চীনাদের সাম্রাজ্য বিস্তারিত হয়ে পড়ে। এখানকার শাসকরা চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে কর যোগাতেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছিল বলে জানা যায় নি। ইন্দোনেশিয়ার জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছে তাতে দেখা যায় তারা যে পদ্ধতিতে এখানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে নূতনত্ব আছে। তিনি বলেছেন, "চীনের রাষ্ট্রদূতরা বন্দরে বন্দরে গিয়ে শাসনকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্যসূচক আলাপের মধ্য দিয়ে বোঝাতেন যে, তারা যেন ব্যক্তিগত ভাবে পিকিং-এ গিয়ে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে তাকে করদান করেন। এই প্রচারের আশ্চর্য রকম ফল পাওয়া গেছে। কয়েক বছরের মধ্যে অনেকেই ধাওয়া করলেন পিকিং-এর দিকে। সবচেয়ে প্রথমে গেলেন 'পুনি'র রাজা। এই পুনি হয় পশ্চিম বোর্নিও, নয় তো ব্রুনেই। এই সময় মালাক্কার রাজাও চীন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন।

একশত বছর পর্যন্ত তারা চীনের করদ রাজা ছিলেন। এরা সবাই ছোট ছোট রাজা। সম্ভবত বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই তারা স্বেচ্ছায় প্রবল পরাক্রমশালী চীনের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিঙ রাজত্বের অবসানে সাম্রাজ্যের বাঁধনটা অনেক পরিমাণ শিথিল হয়ে গেলেও এ সমস্ত অঞ্চলের উপর চীনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এই সময় মসলা-সন্ধানী পোর্তুগীজদের নৌ-বহর এখানকার সমুদ্রে এসে প্রবেশ করল।

বহু শতাব্দী আগে দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুরা এই সমস্ত দ্বীপে কবে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তার স্মৃতিচিহ্ন এখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। কিন্তু বর্তমানে এ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায় সবাই মুসলমান। ভারতবর্ষের

boidownload.com

boidownload.com

গুজরাট রাজ্য থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম এখানে আসে। বাণিজ্যবৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামেরও প্রসার হতে থাকে ; পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বন্দর অঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে যায় এবং নানাভাবেই তাদের অবনতি ঘটতে থাকে। পোর্তুগীজরা যখন এখানে প্রবেশ করল তখন এসব অঞ্চলের মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে খুবই ঠোকাঠুকি চলছিল। কোন বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে এ একটা সুবর্ণ সুযোগ। পোর্তুগীজরা এই সুযোগটাকে তাদের নিজেদের কাজে লাগাতে ত্রুটি করল না।

এবার পোর্তুগীজদের প্রবেশপর্বের কথা বলি। আগেই বলেছি, প্রাচ্য অঞ্চলের সবচেয়ে বেশী মসলা উৎপন্ন হোত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোতে। সেই মসলা মালয়ের মালাক্কা হয়ে ভারতের কালিকট ও অন্যান্য বন্দরে পৌছত। তারপর আরব বণিকরা এই মসলার বোঝাই জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লোহিত সাগরের বন্দরে বন্দরে ভিড়ত। সেখান থেকে সেই মসলা সারা ইউরোপের বাজারে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু পোর্তুগীজরা আপনাদের সমুদ্রের প্রভু বলে ঘোষণা করে পূর্বদেশের এই মসলার বাণিজ্যিকে নিজেদের এক-চেটিয়া করে নিতে চাইল। এই জলদদ্যুদের উৎপাতে অন্যান্য বণিকদের সমুদ্র-পথে চলাচল কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু পোর্তুগীজরা বুঝতে পেরেছিল, যে-পথ দিয়ে মসলা আসে, সেই মালাক্কা প্রনালীতে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারলে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যকে করায়ত্ত করা সম্ভব হবে না।

১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে লোপো দ্য সিকুইয়েরা এই উদ্দেশ্যে ছয়টি জাহাজ নিয়ে মালাক্কা গিয়েছিলেন। অবস্থাটা তদন্ত করে দেখাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। অনুমতি চাইতেই সুলতান রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, বেশ তো, আপনারা আমার এই বন্দরে আর সব দেশের বণিকদের মতই বাণিজ্য করুন, আমার এতে কোন আপত্তি নেই।

boidownload.com

কিন্তু মালাক্কায় যে-সব আরব বণিকরা ছিল, পোর্তুগাল-সম্পর্কে তাদের হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা আছে। এদের অত্যাচারে আরব সাগর আর ভারত মহাসাগরে তাদের বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে। পোর্তুগীজদের চিনতে তাদের বাকী নেই। সেই কথাই তারা অনেক করে বুঝিয়ে বলল সুলতানকে। এরা কি মতলব নিয়ে এসেছ, কি করছে, সব কথাই তারা খুলে বলল। তা ছাড়া মুসলমানদের এমন দুশমন কে আছে আর? এদের আশ্রয় দেওয়া মানে সর্বনাশকে ডেকে নিয়ে আসা।

সুলতান তাদের মুখে এসব কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। জেনে শুনে এমন শত্রুকে কেমন করে জায়গা দেওয়া যায়! তিনি স্থির করলেন, অনুমতি ফিরিয়ে নেবেন। কথাটা কানাকানি হয়ে সিকুইয়েরার কানে এসে গিয়েছিল। তিনি সুলতানের আদেশ পাবার আগেই মালাক্কা ছেড়ে দ্রুত চম্পট দিলেন।

যে-সময়ের কথা বলছি, তখন মালাক্কা একটি আন্তর্জাতিক বন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাভা, মোলাক্কাস এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপে এমন সমস্ত মসলা জন্মত যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত মসলা এসে জমত সেই মালাক্কার বন্দরে। এই মসলা নিয়ে বাণিজ্য করবার জন্য পূর্বে চীন, জাপান এবং পশ্চিমে ভারতবর্ষ, আরব ও পারস্য থেকে বণিকরা এই বন্দরে নিয়মিত যাতায়াত করত। এই সম্পর্কে অ্যালবুকার্ক নিজেই লিখে গেছেন, "প্রতি বৎসরে মালাক্কায় ক্যাম্বে, চাওল, দুবুল, কালিকট, এডেন, মক্কা, শেহর, জেদ্দা, করমণ্ডল, বাংলা, চীন, গোর (?), জাভা, পেগু ও অন্যান্য জায়গা থেকে জাহাজ আসে।"

কুইয়েরার কাছে সমস্ত অবস্থাটা শোনবার পর অ্যালবুকার্ক স্থির করলেন, তিনি নিজেই যাবেন মালাক্কায়। আঠারোটা জাহাজ সাজিয়ে তিনি কোচিন থেকে যাত্রা করে মালাক্কায় এসে পৌছলেন। সেটা ১৫১১ খ্রীস্টাব্দের কথা। বন্দরে নানা দেশের বণিকদের জাহাজ ছিল। একসঙ্গে আঠারোখানি সশস্ত্র পোর্তুগীজ

রণতরীকে আসতে দেখে বণিকেরা ভয়ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে সময় পোর্তুগীজদের নামে সকলেরই হৃৎকম্প। বণিকের কাজ বাণিজ্য, যুদ্ধ তাদের বৃত্তি নয়। কিন্তু পোর্তুগীজদের তো তা নয়। এদের বাণিজ্য আর দস্যুবৃত্তি একই সঙ্গে চলে। ওরা গায়ের জোরে ব্যবসা করে। এদের ভয়ে সবদেশের বণিকরাই সমুদ্রেপথে চলাবার সময় সশস্ত্র হয়ে চলে। কিন্তু বন্দর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্থান। এখানে মারামারি কাটাকাটির জন্য কেউ তৈরি হয়ে থাকে না। ওরা কি পৃথিবীর কোথাও শান্তিতে থাকতে দেবে না?

অ্যালবুকার্ক বন্দরের কাছে এসে ঘোষণা করলেনঃ তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান নও, তারা কোন ভয় করো না। আমরা তাদের কিছু বলন না। কিন্তু মুসলমান যারা, তাদের একটাকেও আমরা ছাড়ব না। আর ঐ হতভাগা মুসলমানদের যারা সাহায্য করতে বা বাঁচাতে চেষ্টা করবে, তাদেরও একই গতি হবে। তোমরা ভাল মানুষেরা যে যেখানে আছ, সেইখানেই চুপ করে থাক। তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, আমাদের কাজ আমরা করি। পোর্তুগীজদের সামনে যে-দুটো জাহাজ, তার মধ্যে কামানগুলো উদ্যত হয়ে আছে। একটু মাত্র সংকেতের অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলো গর্জে উঠে অগ্নিবর্ষণ শুরু করবে। এ রকম দৃশ্য বণিকদের অনেকেরই দেখা আছে। তারা, কি মুসলমান, কি অমুসলমান, সবাই ভয়ে চুপ করে রইল।

অ্যালবুকার্কের নির্দেশে আরব বণিকদের ও ক্যাম্বের মুসলমান বণিকদের জাহাজগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন! সেই আগুনের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।চারদিক। পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই সব জাহাজের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পানির মধ্যে। যারা পারল, সাঁতরে প্রাণ বাঁচাল। কিন্তু অধিকাংশ পানি থেকে উঠতে পারল না। শিকারী পোর্তুগীজরা উল্লাসধ্বনি তুলে জলচর প্রাণীর মত তাদের শিকার করল। চীনা ও হিন্দু বণিকরা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে সে দৃশ্য দেখল।

boidownload.com

boidownload.com

সে দিন ছিল পোর্তুগীজদের পেট্রন সেন্ট জেমসের উৎসব দিবস। অ্যালবুকার্ক আর তার পোর্তুগীজ বাহিনী এইভাবেই সেই পবিত্র দিবস উদযাপন করল। এটাও তাদের সেই ধর্মযুদ্ধেরই একটা অংশ, অ্যালবুকার্ক সে দিন তার লোকদের উদ্দেশ্যে এই কথাই বলেছিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, এইভাবেই আমরা সমস্ত আরবীদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করব, মহম্মদের ধর্মের শিক্ষা চিরদিনের মতো নিবিয়ে দেব, যাতে এরপর তা আর কোন দিন জ্বলে উঠতে না পারে। এইভাবেই আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন করব। প্রভুর প্রতি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করবার পর রাজার প্রতি কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি এ কথা নিশ্চিত ভাবেই জানি, যদি আমরা আরবীদের হাত থেকে মালাক্কার বাণিজ্য ছিনিয়ে নিতে পারি, তাহলে কায়রো ও মক্কা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং ভেনিসের বণিকরা যদি পোর্তুগালে গিয়ে মসলা না কিনে নিয়ে আসে, তবে তাদের মসলা পাওয়ার কোন পথ খোলা থাকবে না।

ধর্মীয় প্রেরণা এবং নগ্ন ও নৃশংস স্বার্থ বুদ্ধির কি এক অপূর্ব সমাবেশ! কিন্তু এটা পোর্তুগীজদেরই একচেটিয়া নয়। এ দৃষ্টান্ত কোন দেশে নেই? মানবতাবিরোধী অতি জঘন্য কাজের সাথে যদি কোন মতে ধর্মকে সংশ্লিষ্ট করে রাখা যায়, তবে তার সব দোষ কেটে যায়। শুধু দোষ কেটে যাওয়াই নয়, সময় সময় তা অতি মহৎ ও পবিত্র কাজ বলেও কীর্তিত হয়ে থাকে।

অ্যালবুকার্ক চীনা বণিকদের কাছ থেকে নৌকা চেয়ে নিয়ে তারই সাহায্যে তাঁর সৈন্যদের মাটিতে নামালেন। পোর্তুগীজরা যুদ্ধ করে নগর অধিকার করবার জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল। যুদ্ধ বাঁধল। প্রথম আক্রমণে পোর্তুগীজদের হটে আসতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে দুপক্ষে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। এইবার নগর পোর্তুগীজদের দখলে এসে গেল। কিন্তু সুলতান আর তার সৈন্যবাহিনী আগেই নগর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

boidownload.com

নগরবাসীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়। যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তাদের পণ্যের মতই ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করা হয়েছিল। কিন্তু তারা নগরের চীনা, হিন্দু ও বর্মীদের কারু গায়ে হাত দেয় নি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দেশের একটা অংশকে হাত করে রাখবার জন্য এই নীতি তারা প্রথম থেকেই অনুসরণ করে এসেছে। এটা খুবই স্পষ্ট যে, তাদের এই তীব্র মুসলমান – বিদ্বেষের মূল কারণ ধর্ম নয়। এর আসল কারণ তাদের বৈষয়িক স্বার্থ বুদ্ধি। এ-বিষয়ে কি রণক্ষেত্রে, কি বাণিজ্যক্ষেত্রে, মুসলমানদেরই তারা সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত। কিন্তু তাই বলে হিন্দু কালিকটকে, তারা রেহাই দেয় নি। কালিকট অধিকার করবার জন্য তারা চেষ্টার ত্রুটি করে নি। তার কারণ এখানে মুসলমান অমুসলমানের প্রশ্নটা মূল প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্ন মসলার বাণিজ্য। নগরের ধনসম্পদ যা-কিছু ছিল, তার প্রায় সবই লুণ্ঠিত হয়ে ছিল। অভিযানে যোগদানকারীদের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ বাটোয়ারা করে দেবার পরও রাজার ভাগ হিসেবে তার কাছে পাঠান হয়েছিল ২,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা (ক্রুজোডো)

মালাক্কা অধিকারের পর অ্যালবুকার্ক তার একজন ক্যাপ্টেন পেরেজ দ্য অ্যানটেডকে চীনসাগরে নৌ-সেনাপতির পদে নিয়োগ করলেন। অপর ক্যাপ্টেন এনটয়ন এব্রিওকে পাঠালেন ইন্দোনেশিয়ার মসলা দ্বীপগুলোর অনুসন্ধানে। কিন্তু পথে বিপদ ঘটার ফলে তিনটা জাহাজের জায়গায় মাত্র একটা জাহাজ ফিরে এল। ভীষণ ঝড়ের ফলে ক্যাপ্টেন সেররাওয়ের জাহাজ ডুবি হোল। তবু অতি কষ্টে তিনি এমবিয়ানা দ্বীপে এসে স্থানীয় সুলতানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সে সময় ইন্দোনেশিয়ার অবস্থাটা তাদের পক্ষে খুবই অনুকূলে ছিল। জাভার নতুন মুসলমান সুলতানরা এবং পুরানো হিন্দু প্রজাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছিল। পোর্তুগীজরা সেই সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। এ সময় সেখানকার রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন ডেমাকের সুলতান। রাজ্যচ্যুত মালাক্কার রাজা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তার কাছে গিয়েছিলেন। ডেmfকের সুলতান

তার সাহায্যের জন্য ১০০ জাহাজ পাঠালেন। মালাক্কা প্রণালীতে পোর্তুগীজদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটল। কিন্তু পোর্তুগীজদের অগ্নিবর্ষী কামানের সামনে কি করবে তারা? তাদের কামানের গোলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার মত সামর্থ্য ছিল না তাদের। তারা দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল! এই যুদ্ধে জয়লাভ করে পোর্তুগীজরা জাভার সমুদ্রে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করে বসল।

এইভাবে আপনাদের সমুদ্র-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠান করে পোর্তুগীজরা প্রাচ্যের মসলা-বাণিজ্যকে মুষ্টিগত করে নিল। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মত কোন শক্তি অবশিষ্ট রইল না। অবশ্য শেষ মুহূর্তে তুর্কীর সুলতান একবার তাদের বিতারিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি। মিশর তখন তুর্কসম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাচের এই মসলার বাজারকে হস্তগত করে নিতে পারলে প্রবল প্রতিদ্বন্দী মুসলমানদের শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া যাবে, পোর্তুগাল-রাজ রাজা হেনরীর পরিকল্পনার মধ্যে এই অভিসন্ধিটা প্রথম থেকেই ছিল। মিশর দখল করবার পর থেকেই তুকীর্র সুলতান সুলেমানের কাছে এই সমস্যাটা প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিল। যে-ভাবে আরব বণিকদের হাত থেকে এতদিনের পুরানো মসলা-বাণিজ্যকে পোর্তুগীজরা ক্রমে ক্রমে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাতে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করলেন তিনি। এ তো শুধু আরব বণিকদের নিজস্ব ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলোর সমৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত হয়ে আছে যে।

কিন্তু কাজটা যে সহজ নয়, সেটা তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই তিনি এ সম্পর্কে মিলিতভাবে কাজ করবার জন্য কালিকটের জামোরিন ও ক্যাম্বের মুসলমান রাজার সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। কালিকট ও ব্যাম্বে এই দুই রাজ্যের বণিকরা দীর্ঘকাল ধরে মসলার বাণিজ্য করে আসছে। পোর্তুগীজদের জোর জুলুমের ফলে তাদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। কাজেই এই দুই রাজ্যের রাজা তুরস্কের সুলতানের এই আহ্বানে সাড়া

boidownload.com

দিলেন। পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে এই তিন শক্তি মিলিত হোল। বহুদিন আগে পোর্তুগীজদের প্রতিরোধ করবার জন্য কালিকট ও মিশর আরও একবার মিলিত হয়েছিল। সেই মিলিত প্রতিরোধের সামনে পোর্তুগীজদের থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মৈত্রী বেশী দিন টিকল না। তার ফলে পোর্তুগীজদের অভিযান বিজয় থেকে বিজয়ে এগিয়ে চলছিল।

কিন্তু সেদিন আর এখনকার মধ্যে অনেক তফাত। সেদিন পোর্তুগীজরা সবে মাত্র প্রবেশ করছিল। আর এখন তারা তিন সমুদ্র জয় করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। এখন তাদের হটিয়ে দেওয়া সহজ নয়।

এই চুক্তি সম্পন্ন করবার পর তুরস্কের সুলতান মিশরের শাসনকর্তা সুলেমান পাশা আল খাদিমকে নির্দেশ পাঠালেন : "মিশরের শাসনকর্তা সুলেমান পাশা, আমার এই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আপনি প্রয়াোজনীয় মালপত্র নিয়ে সুয়েজে চলে যাবেন, এবং ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করবেন। একটি যুদ্ধ বহর সুসজ্জিত করে এবং যথেষ্ট-সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়ে অবিলম্বনে সুয়েজ থেকে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করুন। যে-সকল স্থানে পোর্তুগীজরা মক্কা ও মদিনা যাবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে সেই স্থানগুলো দখল করে নিন। ওরা যে-সমস্ত কুকর্ম করেছে, তার প্রতিকার করুন এবং সমুদ্র থেকে ওদের নিশান অপসারিত করে দিন।"

এই নির্দেশ পেয়ে মিশরের শাসনকর্তা সুলেমান পাশা এক বিরাট বহর নিয়ে ভারতসমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। সেটা ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ। খবরটা পোর্তুগীজদের কাছে অজানা ছিল না। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ ফেব্রুয়ারী তারিখে তুর্কী বহর যখন ভারতবর্ষের কাছাকাছি এসে পৌছেছে, ঠিক সেই সময় পোর্তুগীজ শাসনকর্তা মার্টিন দ্য সুজা কালিকটের যুদ্ধজাহাজগুলোকে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এই খবর পেয়ে সুলেমান পাশা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে মিশরে ফিরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ত্রিশক্তি চুক্তির এই শোচনীয় পরিণতি ঘটল।

boidownload.com

এর পর তুরস্কের সুলতান এই ব্যাপার থেকে একেবারেই হাত গুটিয়ে নিলেন। পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনী আরও ষাট বছর পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে তাদের এই সমুদ্র-সাম্রাজ্য শাসন করে চলেছিল।

একটা জিনিস বিশেষ করে ভেবে দেখবার মত। পোর্তুগীজদের এত বড় শক্তির ভিত্তিটা কোথায়? সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তাদের ঘাঁটি ছিল, কোচিনের দুর্গ, ক্ষুদ্র গোয়া আর বোম্বাই। তখনকার দিনে বোম্বাইর গুরুত্ব খুব কমই ছিল। এই সামান্য ঘাঁটির উপর নির্ভর করে সমস্ত সমুদ্রকে শাসন করত তারা। এ কি শুধু তাদের রণতরী আর কামানের জোরেই? এটা খুব বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। আর এক কথা। মসলার বাণিজ্যকে মুষ্টিগত করবার জন্য সমুদ্রের উপর এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে তুলেছিল তারা। নির্দোষ বণিকদের জানমাল নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলত। কিন্তু তা হলেও একমাত্র কালিকট ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন অঞ্চলে পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। এরই বা কারণ কি?

পোর্তুগীজ নেতাদের কূটনীতি এই সাফল্যের প্রধান কারণ, এটা বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। প্রথম থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল যাতে তারা তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আরব বণিকদের উপর তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। আমরা দেখেছি মালাক্কা পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করে তারা সমস্ত আরবী জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করেছিল, কিন্তু চীনা বা হিন্দু বা বর্মী জাহাজগুলোর কোন ক্ষতি করে নি। এও আমরা দেখেছি, চীনা বণিকরা তাদের নৌকা দিয়ে পোর্তুগীজ সৈন্যদের নামবার জন্য সাহায্য করছিল। কি মালাক্কায়, কি ভারতবর্ষে তারা সব সময় এইটাই দেখাতে চেয়েছে যে, তারা একমাত্র আরব বণিকদের শত্রু আর সকলেরই বন্ধু! এইখানেই তাদের সাফল্যের মূলমন্ত্র। কিন্তু কালিকটে সেই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। কেননা, সেখানে ছিল প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ।

boidownload.com

boidownload.com

দক্ষিণ-ভারতে প্রতিবেশী হিন্দু আর মুসলমান রাজ্যগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই ঠোকাঠুকি চলে আসছিল। এই নবাগত বিদেশী শক্তির মুসলিম-বিদ্বেষে দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলো বেশ প্রীতির চক্ষেই দেখেছিল, মোটামুটি এ কথা বলা চলে। কোচিন হিন্দুরাজ্য। পোর্তুগীজরা যখন প্রথম এল কোচিন রাজ্যের অনুমতি নিয়ে কোচিনের এক দ্বীপে, তারা প্রথম দুর্গ গঠন করে বসল। কোচিন রাজ্যের সঙ্গে তাদের আগাগোড়া প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। এর পর তারা গোয়া অধিকার করে বসল; তাও হিন্দুপ্রধান তুলাজীর সাহায্যে, সে কথা আগেই বলেছি। গোয়ায় আসবার পর হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটল। মুসলমানের শত্রু হিসেবে এখানেও তারা সাদর অভ্যর্থনা পেল। বিজয়নগরের রাজা তার বিস্তীর্ণ রাজ্যে তাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া সমুদ্র-উপকূলে যে-সব ছোট ছোট হিন্দু রাজ্য ছিল, পোর্তুগীজরা তাদের সঙ্গেও সম্প্রীতির সঙ্গে বাণিজ্য করত। এক কথায় বলতে গেলে একমাত্র কালিকট ছাড়া আর কোন হিন্দু রাজ্য থেকে তারা বাধা পায় নি, বরঞ্চ প্রশ্রয়ই পেয়েছে।

হিন্দু রাজারা মনে করতেন, তাদের দেশের বণিকরা তাদের পণ্য পোর্তুগীজ বণিকদের কাছেই বিক্র করুক কি আরব বণিকদের কাছেই বিক্রী করুক তাতে তাদের কি আসে যায়! বরঞ্চ পোর্তুগীজদের সঙ্গে বাণিজ্য করলে অতিরিক্ত লাভটা এই যে, ওদের কাছে প্রয়োজনীয় এমন সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় যা অন্য কারু কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

দেশীয় বণিকরা শ্রীঘ্রই পোর্তুগীজদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তের মধ্যে এসে গেল। তারা ওদের কাছে অনুমতিপত্র নিয়ে বাণিজ্য করত। বাণিজ্য পোর্তুগীজদের একচেটিয়া হয়ে যাওয়ার ফলে প্রদেশের বণিকরা আর এক বিষয়ে নিজদের লাভবান মনে করল। তারা আরব বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারত না। আরব বণিকদের উচ্ছেদ সাধনের ফলে

এদিক দিয়ে তারা নিষ্কন্টক হোল। সম্ভবত সেই একই কারণে ক্যাম্বে ও গুজরাট এই দু'টি মুলসমান রাজ্যকে কখনও পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করতে দেখা যায় নি। মনে হয়, পোর্তুগীজরা তীব্রভাবে মুসলমান-বিদ্বেষী হলেও ভারতীয় মুসলমানদের উপরে হামলা করতে চাইত না। এটা তাদের বিচক্ষণ কূটনীতির পরিচয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নীতির ফলেই তারা মূল শত্রুকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে একমাত্র কালিকট ছাড়া আর কোন রাজ্য থেকেই সক্রিয় বিরুদ্ধতা পায়নি। বরঞ্চ প্রশ্রয় ও সাহায্যই পেয়েছে। এইটাই পোর্তুগীজদের শক্তি ও সাফল্যের প্রধান ভিত্তি।

আট

মার্টিন লুথার খ্রীষ্টানধর্মে নতুন ভাবধারা বয়ে নিয়ে এলেন। প্রাচীন ধর্মীয় রূপের শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে এল প্রোটেস্টন্টবাদ। তার কণ্ঠে নবযুগের উদার আহ্বান। ইউরোপের সমাজদেহে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল। নতুন আদর্শ আর নতুন সম্ভাবনার দ্বারা খুলে গেল।

কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রাচ্যের মসলা-বাণিজ্যের উপর- যে এমনভাবে ঘা মেরে বসবে সে কথা কেইবা ভাবতে পেরেছিল! ঘন্টা বেজে উঠলঃ অঙ্ক শেষ, অভিনেতারা প্রস্তুত হও, তোমাদের প্রস্থানের সময় এসে গেছে। এখন নতুন অভিনেতারা মঞ্চে প্রবেশ করবে।

রোমের পোপ এখন আর সমস্ত খ্রীস্টানজগতের একচ্ছন্ন ধর্মীয় নেতা নন। তাঁর পবিত্র আদেশ এখন শুধু রোমান ক্যাথলিকদের উপরেই প্রযোজ্য।

পোপ নিকোলাস প্রাচ্যজয়ের অধিকার একমাত্র পোর্তুগালকেই দিয়েছিলেন। আর কোন খ্রীস্টান রাজ্যের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

boidownload.com

প্রোটেস্টান্টদের কাছে সেই নিষেধের কোন মূল্য নেই। এতদিন ধরে যারা মুগ্ধ আর লুব্ধ দৃষ্টিতে সম্পদশালিণী ভারতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করছিল, তারা এবার প্রস্তুত হয়ে উঠে বসল।

ইউরোপের মধ্য-উত্তরাঞ্চলেই মসলার চাহিদা সবচেয়ে বেশী। ফলে মসলা বাণিজ্য পোর্তুগালের একচেটিয়া হলেও মসলার বাজার পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে উত্তর দিকে সরে গিয়েছিল। ইউরোপের ভেতরে মসলা নিয়ে ব্যবসা করবার ব্যাপারে ডাচ বণিকরা প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগে পোর্তুগাল মসলার দাম এত বেশী চড়িয়ে দিয়েছিল যে, ডাচ বণিকদের অসন্তোষ দিন দিনই বেড়ে চলছিল। তারা বলাবলি শুরু করল, এত চড়া দাম দিয়ে মসলা কেনা চলবে না, আমাদের বিকল্প পন্থ দেখতে হবে।

বিকল্প পন্থার মানে পোর্তুগীজদের হাত থেকে মসলার বাণিজ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া। ডাচ বণিকদের কাছে এই খবরটা অজানা ছিল না যে, প্রাচ্য অঞ্চলে পোর্তুগীজদের শক্তির ভিত্তিটা খুবই কাঁচা। ভাল করে ঘা দিতে পারলে ওদের শক্তির সৌধটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামের বিশিষ্ট ডাচ বণিকরা এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার জন্য একত্রিত হলেন। সেই সভায় তাঁরা স্থির করলেন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য একটি কোম্পানী গঠন করতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে যাবার পথঘাট এবং সেখানকার অবস্থার সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা তাদের ছিল না। পোর্তুগীজরা ডোম ম্যানুয়েলের রাজত্বকালেও ভারতবর্ষে যাবার পথটাকে একান্তভাবে গোপন করে রাখবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। ডোম ম্যানুয়েল ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নির্দেশ জারী করেন যে, তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে ভারতবর্ষে যাবার পথ-সম্পর্কে কোন রকম ইঙ্গিত আভাস যেন না থাকে।

boidownload.com

আগেকার যে-সব মানচিত্রে পথ-নির্দেশক চিহ্ন ছিল, তাদের সংগ্রহ করে, ঐ চিহ্নগুলো মুছে ফেলবার আদেশ দেওয়া হয়।

পোর্তুগীজরা তাদের এই মহামূল্যবান পথকে অন্য সকলের দৃষ্টি থেকে অতি সঙ্গোপনে রক্ষা করবার চেষ্টা করে চলত। কিন্তু এ যুগে কতদিন পর্যন্ত তা আর সম্ভব? ডাচ বণিকেরা এই সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় গুপ্ত খবরাখবরগুলো সংগ্রহ করে আনবার জন্য কর্ণেলিয়াস দ্য হাউটম্যানকে লিসবনে পাঠান। এ ছাড়া তাদের আরও একটি সূত্র ছিল। জান হুইজেন লিন্সকোটেন এক সময়ে গোয়ার আর্কবিশপের সেক্রেটারি ছিলেন। সেখানে থাকার ফলে প্রাচ্য অঞ্চলে পোর্তুগীজদের শক্তি ও দুর্বলতা-সম্পর্কে ভাল করেই ওয়াকিফহাল ছিলেন তিনি। এইভাবে হাউটম্যান ও লিন্সকোটেনের সাহায্যে ডাচ বণিকেরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করে নিলেন।

১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে ডাচদের প্রথম বহর মসলার সন্ধানে যাত্রা করল। এই বহরে চারটি জাহাজ ছিল। পরিচালক ছিলেন স্বয়ং হাউট-ম্যান। ভারতবর্ষে নয়, এই বহর মসলার উৎপত্তি যেখানে সেই ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে পৌছল। এই প্রথম অভিযাত্রী দল, আড়াই বছর পরে ফিরে এল স্বদেশে। বহু দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। ক্ষয়ক্ষতিও কম ভোগ করতে হয় নি। এই বহর ২৫৯ জন লোক নিয়ে যাত্রা করেছিল। যখন ফিরে এল, তখন তাদের মধ্যে মাত্র ৮৯ জন লোক অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু এই প্রথম যাত্রায় মুনাফার পরিমাণ দেখে ডাচ বণিকরা উল্লসিত হয়ে উঠল। যে—মসলা তারা আমদানি করেছিল, তা বিক্রি করে তাদের ৮০০০ ফ্লোরিন লাভ হয়েছিল।

এইবার পোর্তুগালের একচ্ছত্র সাম্রাজের নতুন ভাগীদার দেখা দিল। এর পর থেকে প্রাচ্য অঞ্চলে ডাচ বাণিজ্য জাহাজের নিয়মিত চলাচল শুরু হয়ে গেল। গড়ে উঠল ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানী সরকার থেকে পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করল। শুধু

boidownload.com

তাই নয়, এই কোম্পানীকে সন্ধি ও মৈত্রী স্থাপন করা, নতুন এলাকা জয় করা, দুর্গ গঠন করা এবং আরও কোন কোন বিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হোল।

এই অধিকারের জোরে কোম্পানী ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজদের চিরশত্রু 'মালাবার সম্রাট জামোরিন'—এর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হোল। সন্ধির উদ্দেশ্যে "সাম্রাটের" রাজ্য এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে পার্তুগীজদের বিতাড়ন। কিন্তু অ্যালবুকার্ক এই সমুদ্র সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যে রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে না পারলে এ কখনও সম্ভব হতে পারে না। ডাচ কোম্পানী স্থির করল, পোর্তুগীজদের প্রথমে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে অপসারিত করতে হবে; কেননা পোর্তুগীজরা তখনও সেখানে দৃঢ় হয়ে বসতে পারে নি।

কোম্পানী এবার তার কর্মসূচী-অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করল। ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে তারা পোর্তুগীজদের হাত থেকে এমবয়না দ্বীপ দখল করে নিল। উপনিবেশ-স্থাপনের পথে এই তাদের প্রথম পদক্ষেপ। এর ১৪ বছর বাদে কোম্পানীর পক্ষে জান পিয়েটার্জ কোয়েন যখন জাকার্তা অধিকার করে বসলেন, সেই দিন থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রাচ্য সমুদ্রের আতঙ্ক পোর্তুগীজ নৌ-বাহিনী এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে পেছনে হটল। এই উপলক্ষে বিজয়ী কোয়েন সেদিন কোম্পানীর ডিরেক্টরদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ উর্বরা ভূমি ও সমুদ্র আপনাদের করতলগত হয়েছে। বিবেচনা করে দেখুন, সাহস থাকলে কি না সম্পন্ন করা যায়। আরও দেখুন, সর্বশক্তিমান ভগবান কিভাবে আমাদের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং আমাদের উপর সৌভাগ্য ধারা বর্ষণ করেছেন!

সেদিন প্রোটেস্টান্ট হল্যাণ্ডের সামাজিক স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের ভগবানকে রোমান ক্যাথলিক পোর্তুগালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে এই রীতিই প্রচলিত হয়ে আসছে। পররাজ্য লুণ্ঠন বা জয় করবার

boidownload.com

জন্যই হোক, অথবা মানুষকে অত্যাচার বা শোষণ করবার জন্যই হোক, কি খ্রীস্টান, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের ভগবানকেই ভক্তদের সঙ্গে এই কাজে শরীক হতে হয়। অতীতেও তাদের এই দায়িত্ব ছিল, বর্তমানেও তা শেষ হয়ে যায় নি।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের এন্টনি ভ্যান ভিয়েমেন এই নতুন ডাচ সাম্রাজ্যের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনিই এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং পোর্তুগীজদের বিতাড়ন কার্য তার হাতেই সুস্পন্ন হয়।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পোর্তুগীজদের হাত থেকে মালাক্কার শক্তিশালী ঘাটি ছিনিয়ে নিলেন। অ্যালবুকার্ক যে রক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, এবার তার মধ্যে ভাঙ্গন ধরল। এবার ঘাঁটিতে বসে ডাচ ঔপনিবেশিকেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্যের দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সেই বাণিজ্য তখনও পোর্তুগীজদের হাতেই ছিল। পোর্তুগীজরা ইতিপূর্বে সিংহলের কলম্বো বন্দরে ঘাঁটি করে বসেছিল। ডাচদের পরিকল্পনা ছিল, এই কলম্বো থেকেই ভারতবর্ষের পোর্তুগীজ ঘাঁটিগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে হবে। সে সময় কলম্বোর পোর্তুগীজদের সঙ্গে সিংহলের রাজাদের সংঘর্ষ চলছিল। ডাচরা মালাক্কা থেকে সিংহলের রাজাদের সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু কলম্বো থেকে পোর্তুগীজদের হটিয়ে দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত তারা ঐ ঘাঁটি আঁকড়ে ধরে ছিল। অবশেষে ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে ভ্যানডারহেডেন বহুদিনের জন্য: এই বন্দর অবরোধ করে রাখেন। তার ফলে পোর্তুগীজরা সিংহল ছেড়ে যেতে, বাধ্য হয়।

কলম্বো হাত ছাড়া হয়ে যাবার পর পোর্তুগীজদের এই সমুদ্র-সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট যা ছিল, তা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ল। পোর্তুগীজরা সর্বপ্রথম কোচিনে এসে বসেছিল। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ডাচরা তাদের হাত থেকে সেই কোচি ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ছোট ছোট বাণিজ্যকন্দ্রেগুলো একটির পর একটি খসে খসে পড়তে লাগল। পোর্তুগীজরা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বোম্বাই বন্দরকে ইংল্যাণ্ডের

boidownload.com

রাজার কাছে যৌতুরূপে উপহার দিয়েছিল। সব গিয়ে বাকী রইল গোয়া, ছোট দুটি দ্বীপ দোমন আর দিউ। সেই গোয়া, দামান আর দিউ সেদিন পর্যন্ত পোর্তুগীজদের হাতেই ছিল।

পোর্তুগীজরা এ অঞ্চলে মসলার বাণিজ্য করতে এসেছিল। এই বাণিজ্যকে মুষ্টিগত করেই তারা তৃপ্ত ছিল। কালিকট রাজ্য দখল করতে গিয়ে যেন চূড়ান্ত পরাজয় তাদের বরণ করতে হয়েছিল, তারপর থেকে কলম্বো ভূমিতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আর তারা বেশী সচেষ্ট হয় নি। অবশ্য গোয়া, মালাক্কা এবং ইন্দোনেশিয়ার কোন কোন দ্বীপে তারা যে উপনিবেশ স্থাপন করে নি তা নয়, কিন্তু তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মসলার বাণিজ্যটাকে পাহারা দিয়ে রাখা। আরও কিছু সময় হাতে পেলে এখানেও তারা বড় বড় উপনিবেশ গড়ে তুলত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ডাচ সাম্রাজ্যবাদ সেই সুযোগ তাদের দিল না। তাদের হাতে বিষম মার খেয়ে তারা লেজ গুটিয়ে গোয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

আমরা দেখেছি, ডাচরা পোর্তুগীজদের মতই মসলার গন্ধে গন্ধে ইন্দোনেশিয়ায় এসে পৌছেছিল। কিন্তু পোর্তুগীজদের ভাগিয়ে দিয়ে নিষ্কন্টক ইন্দোনেশিয়ায় একটু গুছিয়ে বসবার পরই তারা শুধু মসলার বাণিজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে সাম্রাজ্য গড়বার দিকেও মন দিল।

সাম্রাজ্যবাদের পুরোপুরি রূপটা এই ডাচ ঔপনিবেশিকদের মধ্যেই প্রথম দেখতে পাই। বান্দা, এমবয়না, মালাক্কাস প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের তারা এক নতুন প্রণালীতে শোষণ করতে শুরু করল। পোর্তুগীজরা মসলা নিয়ে বাণিজ্য করত, কিন্তু মসলা উৎপাদন করার কথাটা সম্ভবত তাদের মাথায় আসে নি, আর যদি এসেও থাকে, অতি উৎসাহ ও ধৈর্য তাদের ছিল না।

ডাচ বণিকরা মসলা-চাষীদের ফসলের জন্য আগাম হিসেবে দাদনের টাকা দিয়ে রাখত। সরলপ্রাণ চাষী তাদের এই ফাঁদে ধরা দিল। আর তার পরিণামে যা ঘটবার তাই ঘটল। এই দাদনের সুযোগ নিয়ে নানারকম ছল ছুতো

boidownload.com

boidownload.com

ও প্রবঞ্চনার সাহায্যে চাষীদের জমি কোম্পানীর হাতে গিয়ে জমা হতে লাগল। ভারতবর্ষে ইংরাজের আমলে নীলকর সাহেবরা এই দাদন নিয়েই কেমন করে নীলচাষীদের সর্বস্বান্ত করেছিল, সেই নিদারুণ ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। অনুরূপ ঘটনাই সেদিন ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে ঘটে চলেছিল। রাজশক্তি ডাচদের হাতে, তাই ডাচ বণিকদের এই অত্যাচার থেকে দুর্ভাগা অসহায় চাষীদের রক্ষা করবার মত কেউ ছিল না। অভাব আর অত্যাচারে ক্লিষ্ট চাষীরা আল্লার নাম স্মরণ করে মাথা চাপড়ে মরছিল। কিন্তু জাকার্তা বিজয়ী ডাচ বীর জন পিয়েটার্চ কোয়েন তো আগেই বলেছিলেন, সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন এবং আমাদের উপর সৌভাগ্যধারা বর্ষণ করেছেন। এ অবস্থায় দুভাগা চাষীরা কি-ই করতে পারে!

এইভাবে চাষীদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে কোম্পানী সেই সব জমিতে নিজ কর্তৃত্বে মসলা জন্মাতে লাগল। ক্ষেতে চাষের কাজ অবশ্য স্থানীয় চাষীরাই করত। তবে আগে তারা নিজেদের জমিতে কাজ করত, নিজের পরিশ্রমে ফল নিজেই ভোগ করতে পারত, আর এখন? এখন তারা কোম্পানীর বাগিচায় জনমজুর খেটে মরছে। মজুরী হিসেবে প্রভুরা যা দিত, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে হোত। শুধু তাই নয়, আরও আছে। কোম্পানী নির্দেশ দিলঃ কোম্পানীর বাগিচার বাইরে যে-সমস্ত চাষীর নিজের জমি আছে, তারা সেই জমিতে লবঙ্গ গাছ লাগাতে পারবে না। আর তাদের জমিতে যে-লবঙ্গ গাছ আছে তা উপড়ে ফেলতে হবে।

চাষীরা ক্ষেপে উঠল, এ কেমন কথা, আমাদের জমিতে আমরা লবঙ্গ ফলাতে পারব না? এ কোন দেশী জুলুম? কিন্তু কোম্পানীর লোকেরা তাদের কথায় কান পাতল না। তারা ঘোষণা করে দিল, কোম্পানীর আদেশ মানতেই হবে। যারা মানবে না, তাদের কপালে দুঃখ আছে। তারা সত্য কথাই বলেছিল, যারা এই নির্দেশ অমান্য করেছিল, বহু দুঃখ দুর্ভোগ তাদের অদৃষ্টে ছিল। স্থানে

স্থানে এই নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধল। অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত, সশস্ত্র চাষীদের রক্তে তাদের চাষের জমি লাল করে তুলল। যেই মসলা বাণিজ্যের দৌলতে দেশবিদেশের বণিকের এত সমৃদ্ধি, সেই মসলা উৎপাদনকারীদের এই হোল পরিণতি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই সমাজের এই তো রীতি। যারা উৎপাদন করে, অভাব ও অনশন তাদেরই প্রাপ্য। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে দমন নীতির হিংস আক্রমণ তাদের উপরেই নেমে আসে। যুগ যুগ ধরে এই রীতিই চলে আসছে। আজও কি চলছে না?

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তার কাটা কথাই বা লেখা আছে? যারা ইতিহাস রচনা করেন, তাদের মধ্যে ক'জন এদের কথা চিন্তা করেন? যারা ইতিহাস পড়ে, তাদের মধ্যে ক'জনাই বা এদের কথা শুনতে চায়? তবু যাদের দেখবার মত চোখ আছে, তারা এই ইতিহাসের পাতায় ফাঁকে ফাঁকে এদের আশাআকাঙ্ক্ষা দুঃখ-লাঞ্ছনা। আর প্রতিরোধ ও সংগ্রামের আবিস্মরণীয় কাহিনীর সন্ধান পাবে।

একজন ডাচ ঐতিহাসিক মোলাক্কাসের মসলা চাষীদের দুর্দশার বর্ণণা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ কোম্পানী তাদের লবঙ্গ বাগিচাকে ভেঙ্গে তা ধানের ক্ষেত্র ও সাগুর বাগিচায় পরিণত করতে বাধ্য করল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতসংকুল দ্বীপগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন সম্ভবপর নয়। কাজেই স্থানীয় অধিবাসীরা কোম্পানীর কাছ থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ চাউল কিনতে বাধ্য হোত। কোম্পানী অত্যধিক চড়া দরে তাদের কাছে চাউল বিক্রী করত। ফলে তাদের অবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে দাঁড়াত। এইভাবে মোলাক্কাসের আর্থিক বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ল এবং তার অধিবাসীরা চরম দারিদ্র্যের শিকারে পরিণত হোল। (Bervard H. M. Vlekke- "Nansautra")

এতদিন এখানকার মসলা চাষীরা প্রাচুর্যে না হলেও সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু ডাচ কোম্পানী তাদের হাত থেকে মসলার চাষ জোর করে কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্দশার চরম সীমায় পৌছে দিল। এ অবস্থা প্রথমে ঘটল

boidownload.com

মোলাক্কাসে। তারপর জাভায় তারপর অন্যান্য দ্বীপে। অর্থাৎ কোম্পানী যেই দ্বীপ অধিকার করে বসল, সকলেই ওই একই অবস্থায় গিয়ে পৌছল।

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের শাসনব্যবস্থা ছিল চরম অব্যবস্থা। এজন ডাচ ঐতিহাসিক বলেছেনঃ ধ্বংস, প্রতিরোধ এবং পাল্টা অত্যাচার এই হচ্ছে মোলাক্কাসের ধারাবাহিক একঘেঁয়ে কাহিনী।

ইংরাজ লেখক জে, এস, ফার্নিভাল ডাচদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদের ঔপনিবেশিখ নীতির সমর্থক। সেই কার্নিভালকেও একথা লিখতে হচ্ছেঃ সমস্ত পৃথিবীতে যত লবঙ্গের প্রয়াোজন, এক এমবয়না দ্বীপেই তার চেয়ে বেশী লবঙ্গের উৎপন্ন হতে পারে। সেইজন্যেই ডাচরা 'টারনেট'-এর রাজাকে টাইডোর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে তুলেছিল, যাতে তার দেশের লোকেরা লবঙ্গ চাষ থেকে নিবৃত্ত থাকে। বান্দা দ্বীপের চাষীরা স্বাধীনভাবে লবঙ্গ চাষ করত, ডাচরা তাদে সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষ ব্যবস্থা করল। তারা জাভায় চাউলের সরবরাহ বন্ধ করে দিল। ফলে তাদের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়াল সাগু। চাউলের চেয়ে অনেক কম পুষ্টিকর। ক্রমাগত তাই খেয়ে চলবার ফলে পুষ্টির অভাবে জাভায় বহু লোক মারা গেল। তাদের অভাব পূর্ণ করবার জন্য আরও বেশি ক্রীতদাস আমদানি করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। বহুদূর থেকে এমনকি আরাকান থেকে পর্যন্ত ক্রীতদাস আমদানি করা হোত। তবে সবচেয়ে বেশী ক্রীতদাস মিলত এই দ্বীপগুলো থেকেই। যেই দ্বীপে খাদ্যাভাব ঘটত, সেখানকার লোকেরা অন্যান্য দ্বীপ থেকে ক্রীতদাস বন্দী করে নিয়ে এসে তাদের বিনিময় করে চাউল সংগ্রহ করত।

ডাচদের পক্ষ সমর্থক ফার্নিভাল, তার বর্ণনা থেকেই আমরা ডাচদের শাসনব্যবস্থার এই পরিচয় পাচ্ছি। যে-কোন পন্থায় লুণ্ঠন করা, এই ছিল তাদের রাজত্বের একমাত্র নীতি। ইন্দোনেশিয়ার মানুষ মরুক আর বাঁচুক, তা নিয়ে তারা এতটুকুও মাথা ঘামাত না।

boidownload.com

ইন্দোনেশিয়ার মানুষদের সম্বন্ধে কি ভাবত তারা?

বাটাভিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কোয়েন এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমতটা স্পষ্ট ভাবেই বলে গেছেন। তিনি বলেছেনঃ ইউরোপের কোন লোক কি তার গরু ঘোড়াকে নিয়ে যা খুশী করতে পারে না? হল্যাণ্ডে পশুরা যেমন তার প্রভুদের সম্পত্তি, তেমনি এখানকার মানুষ এবং তার নিজস্ব বলতে যা কিছু আছে, সবই তার প্রভুর সম্পত্তি। রাজার ইচ্ছা হচ্ছে এদেশের আইন এবং সবচেয়ে শক্তিশালী যে, সেই হচ্ছে রাজা।

কোয়েন এ সম্পর্কে তাঁর মনগড়া উক্তি করছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান কারু শাসনব্যবস্থায় এমন বিধান নেই যার সাহায্যে শাসক তার প্রজাদের নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারেন। এটা কোয়েনের নিজের মতবাদ। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের কার্যকলাপ এই মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মতবাদের সাহায্যেই ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার লোকদের সঙ্গে একশো বছর ধরে কুলীর মতই ব্যবহার করে এসেছে।

এখন মসলার বাণিজ্যের অবস্থা কি দাঁড়াল, সেইটা বলি। আঠারো শতকের শুরু পর্যন্ত এই বাণিজ্য থেকে ডাচরা প্রচুর মুনাফা উসুল করে নিচ্ছিল। ডাচদের প্রথম জাহাজটি মোলাক্কাস থেকে যে-লবঙ্গ বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই লবঙ্গ বিক্রী করে তারা শতকরা ২৫০০ ভাগ অর্থাৎ ২৫ গুণ মুনাফা লাভ করেছিল। কিন্তু আঠারো শতকের প্রথম ভাগ থেকেই তাদের মুনাফার হারটা ক্রমশই কমে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে কফি এসে বাজার জুড়ে বসল। সমস্ত ইউরোপময় অপর্যাপ্ত তার চাহিদা। যারা কফির বাণিজ্য করত, তারা প্রচুর মুনাফা লুটতে লাগল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বাজারে কফি চালু হয়। দেখতে দেখতে তা অতি জনপ্রিয় পানীয় হয়ে দাঁড়াল। ডাচ কোম্পানীর দৃষ্টি এবার কফির উপর গিয়ে পড়ল। এই আঠারো শতকের প্রথম ভাগে তারা দক্ষিণ-ভারতের মালাবার অঞ্চল

boidownload.com

থেকে কফির চারা আনিয়ে জাভায় কফির চাষ শুরু করে দিল। কয়েক বছরের মধ্যেই কফি এই দ্বীপের প্রধান ফসল হয়ে দাঁড়াল। লবঙ্গ সসম্মানে পিছে হটে গেল।

দুনিয়ার বাজারে কফি তখন খুবই উচ্চ মূল্যে বিকাচ্ছে। এই ফসল দিয়েই এই সমস্ত দ্বীপবাসীদের হারানো সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়ে আনা যেত। কিন্তু এদের সুখ সমৃদ্ধির কথা নিয়ে কোম্পানী কখনোই মাথা ঘামাতে না। শুধু তাই নয়, তারা মনে-প্রাণে ছিল এর বিরোধী। এই সময়কার দলিলপত্র ঘাঁটলে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, এগুলোর ছত্রে ছত্রে 'পাছে জাভাবাসী অতিরিক্ত ধনী হয়ে যায়' এই আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। ডাচদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত জাভার সম্পদ শোষণ করে নিজেদের ভান্ডারকে পূর্ণ করে তোলা। দ্বিতীয়ত জাভাবাসীদের সুখসমৃদ্ধির সম্ভাবনার পথে যত বেশী সম্ভব বাধা দান করা। এই কথাগুলো প্রকাশ্যে ও সোজাসুজি বলতে তাদের কোন সংকোচ বা কুণ্ঠা ছিল না।

এই উদ্দেশ্যকে হাসিল করবার জন্য তারা তিনটিপন্থা অবলম্বন করল?

(১) বাটাভিয়ার বাজারে কফির দরকে যথেষ্টভাবে কমিয়ে দেওয়া, (২) কফি-বাগানের প্রসার সীমাবদ্ধ করে রাখা, (৩) চাষীদের প্রবঞ্চিত করবার জন্য নানারকম সুপরিকল্পিত কৌশল। এই সমস্ত চক্রান্তের ফলে ইন্দোনেশিয়ার চাষীকে বাধ্য হয়ে সওয়া শো পাউন্ড কফির মূল্যে আড়াই শো পাউন্ড কফি বিক্রী করতে হোত। কিন্তু সেইখানেই এর শেষ নয়। নানারকম হিসেব দেখিয়ে কাট ছাঁট করবার পর শেষকালে মাত্র চৌদ্দ পাউণ্ড কফির দাম চাষীর ঘরে গিয়ে পৌছত।

অতি বীভৎস ও নগ্ন এই শোষণের রূপ। এভাবে প্রতারিত হয়ে চাষীরা কফি চাষ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু এ বিষয়ে চাষীর স্বাধীন ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন স্থান ছিল না। ইংরাজের আমলে ভারতের নীলচাষীদের

boidownload.com

মত জোর করে এদের দিয়ে কফি চাষ করানো হতে লাগল। কোম্পানী নির্দেশ দিল কফি চাষ করতেই হবে এবং তাদের কাছে নির্ধারিত মূল্যে তা বিক্রী করতে হবে। কোম্পানীর পক্ষের বক্তব্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট, তার মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। এই দেশ এবং এই দেশের মানুষ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। সেইজন্যই সেই মানুষদের হটিয়ে মুনাফা অর্জন করবার পুরোপুরি অধিকার তাদের আছে। তাদের দৃষ্টিতে সমগ্র লাভা দ্বীপ ছিল একটা বিরাট কফিবাগান আর তারা সেই বাগানের একচ্ছত্র মালিক। তারা মনে করত এই মালিকানার জোরে তারা আইনত এখানকার লোকদের নেহাৎ বাঁচার মত মজুরী থেকেও বঞ্চিত করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে এটা নতুন বা অস্বাভাবিক কথা নয়। কিন্তু ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষুলজ্জা বলতে কিছু ছিল না। তাদের মনের কথাটা তারা স্পষ্টভাবেই বলত।

মসলার কথা বলতে বসেছি, কফির কথা আমাদের আলোচ্য নয়। তবু কফির চাষ ও বাণিজ্য সম্পর্কে এটুকু কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কফির চাষ চালু হবার ফলেই এখানে লবঙ্গ ও অন্যান্য মসলার চাষ কমে আসতে থাকে। তাছাড়া আরও একটা কথা আছে। মসলার প্রশ্নে ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ার চাষীদের যে সম্পর্ক ছিল, তা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে আসছিল। কখনও তা নিঃশব্দে এসেছে, কখনও বা এর বিরুদ্ধে চাষীরা প্রতিবাদ তুলেছে, সংগ্রাম করেছে। কিন্তু তা ডাচ ঔপনিবেশিকবাদীদের নির্মম আঘাতের ফলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কফি চাষের ব্যাপারে তা চূড়ান্ত পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছল।

ডাচ বণিকরা প্রথম যখন এসেছিল, তখন তারা পোর্তুগীজদের মতই বণিকদের কাছ থেকে মসলা কিনত, আর সেই মসলা ইউরোপে চালান দিয়ে উচ্চহারে মুনাফা লুটত। বাণিজ্যটা তাদের একচেটিয়া হলেও এ ব্যাপার দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার উপর তারা কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করত না।

boidownload.com

boidownload.com

কিন্তু এই মুনাফা নিয়ে বেশী দিন তারা সন্তুষ্ট রইল না। রক্তের স্বাদ পেয়ে তাদের লোভ ক্রমেই বেড়ে চলল। আমরা আগেই দেখেছি, লবঙ্গ-চাষীদের হাত থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে এবং চাষীদের মধ্যে লবঙ্গ চাষ নিষিদ্ধ করে দিয়ে কিভাবে তারা কোম্পানীর নিজস্ব বাগান গড়ে তুলছিল। এইভাবে এককালের স্বাধীন চাষী ডাচদের বাগানের কুলীতে পরিণত হতে লাগল। এই রূপান্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছল। বড় বড় কফি বাগান গড়ে তোলবার মধ্য দিয়ে।

যেন সমস্ত জাভা দ্বীপটা একটা বাগান হয়ে দাঁড়াল। কয়েকজন বাগানের মালিক আর বাকী সবাই কুলী। মালিকরা শুধু বাগানেরই মালিক নয়, তারা কুলীদের জীবনের ভাগ্যবিধাতা। এই কুলীরা সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মালিকরা যত অত্যাচারই করুক, তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার মত জায়গা তাদের ছিল না। এভাবে একটা দেশের সমস্ত মানুষকে কুলীতে পরিণত করবার মত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

নয়

প্রথমে পোর্তুগীজ, তারপর ডাচ এবং সর্বশেষে ইংরেজরা মসলার খোঁজে মসলার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় এসে প্রবেশ করল।

ইংল্যাণ্ডে মসলার প্রচুর চাহিদা ছিল। তাদের শরৎকাল থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত নোনা-মাংস খেয়ে থাকতে হোত। ভাল টাটকা মাংস তাদের কপালে খুব কমই জুটত। জেলেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের বেশী করে মাছ খেতে বাধ্য করা হোত, যেটা তারা কমই পছন্দ করত। মাছগুলোকে একটু মুখরোচক করে তোলবার জন্য তাদের ঝাল মসলার প্রয়োজন পড়ত। সেদিক দিয়ে

আমাদের চেয়ে তাদের মসলার চাহিদা ছিল বেশী। তা ছাড়া তারা বেশী মসলামিশ্রিত মদটা বেশী পছন্দ করত।

পোর্তুগীজদের সরিয়ে দিয়ে ডাচরা তাদের একচেটিয়া মসলার বাণিজ্য দখল করে নিল। ইউরোপের নানা দেশের বণিকরা তাদের কাছ থেকে মসলা আমদানি করত। ইংরেজরাও সেই সূত্রেই মসলা পেয়ে আসছিল। কিন্তু একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ পেয়ে ডাচদের লোভের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে তারা যখন এক পাউন্ড গোল মরিচের দর ৩ শিলিং থেকে ৮ শিলিং-এ চড়িয়ে দিল, ইংরেজ বণিকরা তখন বেঁকে বসল। তারা স্থির করল। তারা প্রাচ্যের মসলার বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

ডাচদের ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠির এক বছর আগে ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাচ্যে একচেটিয়াভাবে বাণিজ্য করবার জন্য রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে সনদ পেয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবার মসলা-বাণিজ্যে নামল। কোম্পানীর প্রথম জাহাজ ১৬০১ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ জানুয়ারী তারিখে এই উদ্দেশ্যে প্রাচ্য অঞ্চলে যাত্রা করল। এই জাহাজ মসলার সন্ধানে ইন্দোনেশিয়ার আচিন ও সুমাত্রায় গিয়ে পৌঁছল।

আড়াই বছর পরে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে জাহাজটি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড গোলমরিচ নিয়ে ইল্যাণ্ডে ফিরে এল। এর পরে আরও কয়েকবার কোম্পানীর জাহাজ মসলা-দ্বীপ থেকে মসলা নিয়ে এসেছে। কিন্তু কোম্পানীর এতে বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। ব্যবসাটা একতরফা ভাবে চলছিল। মসলার মূল্য বাবদ দেশের অর্থ বাইরে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে অর্থ আসছিল না। ইংল্যাণ্ডের তখনকার অর্থনীতিবিদরা এ ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছিলেন।

কিন্তু এই সমস্ত মসলা-দ্বীপে কোম্পানীর নিজস্ব লোক যারা ছিল, তারা একটা নতুন পন্থা উদ্ভাবন করল। তারা জানাল, এই সব দ্বীপে ভারতীয় বস্ত্রের খুবই চাহিদা। ভারত থেকে বস্ত্র নিয়ে এসে যদি বান্টাম ও মালাক্কাস দ্বীপে বিক্রী

boidownload.com

করা যায়, তাহলে তা থেকে যা মুনাফা হবে, তাই দিয়ে প্রচুর মসলা কিনে নেওয়া যাবে। ইংরেজি বণিকরা এই যুক্তিটা মেনে নিল এবং এই উদ্দেশ্যে ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের সুরাট বন্দরে একটা বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে বসল। কিভাবে তারা সুরাটে ঘাঁটি স্থাপনের জন্য মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে নিয়েছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাধারণ পাঠকও তা জানে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চৌদ্দ বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে মসলার বাণিজ্য করছিল। কিন্তু ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাচদের চাপে তাদের ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হোল। এর পর তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। ইংরেজ বণিকদের মসলার বাণিজ্যের এইখানেই ইতি।

ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে মসলার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানকার মসলা পরপর তিনটি ইউরোপীয় শক্তিকে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। বাণিজ্য করতে এসে শেষ পর্যন্ত এর সাম্রাজ্য বিস্তার করে বসল।

এই মসলা-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কত শক্তির উত্থান পতন ঘটেছে। বণিকদের মুনাফার তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে। তদের রক্ত তিন সমুদ্রের জলে মিশে আছে।

এই মসলা-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কত দেশ তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে, কত মানুষের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। এই মসলার যুদ্ধ সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর কঠিন আঘাত হেনেছে। যে-চাষীরা মসলা উৎপন্ন করত – তাদের জমি আর স্বাধীন জীবিকা থেকে উচ্ছন্ন করে দিয়ে নিঃসম্বল কুলীতে রূপান্তরিত করেছে। তাদের সম্পদ তাদের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে— অপনা মাংসে হরিনা বৈরী।

এই মসলার যুদ্ধ রক্তাক্ত, হিংস্র, বীভৎস! আবার এই মসলার যুদ্ধ প্রাচ্যের পরিবর্তনহীন পশ্চামুখী সমাজের সামনে বৃহৎ বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

boidownload.com

বদ্ধ জীবনের উপরে দুরন্ত ঝটিকার আলোড়ন জাগিয়েছে, প্রচণ্ড অত্যাচারের শক্তি স্বপ্ন-দেখা ঘুমন্ত মানুষকে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তুলেছে!

ওটাও সত্য। এটাও সত্য। কোনটাই মিথ্যা নয়।

boidownload.com

“গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন”
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট
(সেকায়েপ) পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়।

boidownload.com